গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৪ বর্ষ ২৪ সংখ্যা | ২৮ জানুয়ারি - ৩ ফেব্রুয়ারি ২০২২ | www.ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

মহান লেনিন স্মরণে

ঘাটশিলায় মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষ চিন্তাধারা শিক্ষাকেন্দ্রে ২১ জানুয়ারি মহান লেনিনের ৯৯তম স্মরণ দিবসে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ

পাড়ার পাঠশালা স্কুলের বিকল্প হতে পারে না

রাজ্যের সর্বত্র স্কুল খোলার দাবি উঠছে। ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে উদ্বিগ্ন অভিভাবকরা। অবিলম্বে স্কুল খোলার দাবিতে ছাত্র সংগঠন এ আই ডি এস ও-র বিক্ষোভে তাঁরা নিজেদের ছেলেমেয়েদের অংশ নিতে পাঠিয়েছেন। বলেছেন, কোভিডের থেকেও বড় বিপদ হিসাবে এসেছে ওদের ভবিষ্যৎ নষ্টের সম্ভাবনা। রাজ্যের অভিভাবকদের এই উদ্বেগ রাজ্যের মন্ত্রীদের মনকে ছুঁতে পারেনি। তাই অত্যন্ত কৌশলে শিক্ষামন্ত্রী স্কুল খোলার প্রসঙ্গ এড়িয়ে গেছেন। হঠাৎই তাঁরা দুয়ারে সরকারের ধাঁচে 'পাড়ায় শিক্ষা'র ঘোষণা করেছেন। ছাত্রছাত্রীদের অপূরণীয় ক্ষতিতে উদ্বিগ্ন শিক্ষকরা ইতিমধ্যেই 'চলো স্কুলে পড়াই' কর্মসূচি নিয়ে এলাকায় এলাকায় স্কুল চত্বরে ক্লাস নিতে শুরু করেছেন। এই অবস্থায় হঠাৎ সরকারের পাড়ায় পড়ানোর কর্মসূচি কেন? পড়াতেই যদি তাঁরা চান তবে স্কুলে নয় কেন? তা হলে কি তাঁরা স্কুল খুলতে চান না? নাকি স্কুলের গুরুত্বকে তাঁরা ধীরে ধীরে লঘু করে দিতে চান? রাজ্যের

চারের পাতায় দেখুন

কলেজ স্ট্রিটে বক্তব্য রাখছেন এআইডিএসও-র রাজ্য সহ সভাপতি কমরেড চন্দন সাঁতরা

হাসপাতালে ওষুধ কমানোর প্রতিবাদে

জেলায় জেলায় বিক্ষোভ

সম্প্রতি রাজ্য সরকার প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, মহকুমা হাসপাতাল এবং স্টেট জেনারেল হাসপাতালগুলিতে যেভাবে ওষুধের সংখ্যা অর্ধেক করার কথা ঘোষণা করেছে তার বিরুদ্ধে ১৭ জানুয়ারি এস ইউ সি আই (সি) পূর্ব মেদিনীপুর জেলা কমিটি সিএমওএইচ দপ্তরে বিক্ষোভ দেখায়। তারপর শহরে মিছিল করেন দলের কর্মীরা। নেতৃত্ব দেন দলের জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য প্রণব মাইতি, জ্ঞানানন্দ রায়, চিন্ময় ঘোড়াই, তপন জানা, অনুপ মাইতি প্রমুখ।

বিক্ষোভ সভায় বক্তারা ক্ষোভের সাথে বলেন, সরকারি হাসপাতালগুলিতে ২৮৩ রকমের ওষুধ কমিয়ে দিয়েছে রাজ্য সরকার। ক্যান্সার, ডায়াবেটিস সহ বেশিরভাগ জীবনদায়ী ওষুধ তালিকায় বাদ পড়েছে। যার পরিণামে সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষ চিকিৎসা পরিষেবার আওতার বাইরে চলে যাবেন। বাড়বে বেসরকারি ব্যবস্থার রমরমা। সর্বস্বান্ত হবেন সাধারণ মানুষ।

বসিরহাট ঃ ওষুধ কমানোর প্রতিবাদে বসিরহাট জেলা হাসপাতালে বিক্ষোভ দেখায় ও স্মারকলিপি দেয় এস ইউ সি আই (সি) বসিরহাট সাংগঠনিক জেলা কমিটি।

চারের পাতায় দেখুন

১৭ জানুয়ারি এস ইউ সি আই (সি) পূর্ব মেদিনীপুর জেলা কমিটির নেতৃত্বে সিএমওএইচ দপ্তরে বিক্ষোভ

ভক্তির ভেকধারীদের কাছে মূল্যহীন নেতাজির আদর্শ

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বেঁচে থাকলে বোধহয় আবার বলে উঠতেন তাঁর 'সাগর তর্পণ' কবিতার সেই বিখ্যাত লাইনগুলি— 'স্মরণ-চিহ্ন রাখতে পারি শক্তি তেমন নাই/প্রাণ-প্রতিষ্ঠা নাই যাতে সে মূরৎ নাহি চাই।'

২৩ জানুয়ারি নেতাজি সুভাচন্দ্র বসুর ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে দিল্লির ইন্ডিয়া গেটে এই মহান বিপ্লবীর হলোগ্রাম (লেজার রশ্মির সাহায্যে তৈরি) মূর্তি উদ্বোধন করতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'স্বাধীন অসাম্প্রদায়িক ভারতের বিশ্বাস জুগিয়েছেন নেতাজি'। বলেছেন, 'স্বাধীন ভারতের স্বপ্নপূরণ এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা'। প্রধানমন্ত্রী জানিয়ে দিয়েছেন, কিছুদিনের মধ্যেই ওই জায়গায় নেতাজির বিশাল আকারের গ্রানাইট পাথরের মূর্তি বসাবে কেন্দ্রীয় সরকার। প্রধানমন্ত্রী বলে দিয়েছেন, এই সুবিশাল মূর্তি হবে জাতির প্রতি নেতাজির অবদানের প্রতীক।

সত্যিই কি তাই? নিষ্প্রাণ পাথরের মূর্তিই হবে নেতাজির প্রতীক, তাঁর স্বপ্নের, তাঁর উত্তরাধিকারের প্রতীক? দিল্লির বুকে দ্বিতীয় নেতাজি মূর্তিটি বসানোর কৃতিত্ব নিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁর দলের ছোট-বড় নানা স্তরের নেতারা যে উচ্চকণ্ঠের বাণী দিয়ে চলেছেন তাতে মনে হতে পারে এ ভূ-ভারতে তাঁদের মতো নেতাজি ভক্ত আর মিলবে না।

কিন্তু, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি চালিত আজকের ভারতের চিত্র দেখলে কি মনে হয় এই মহান বিপ্লবীর এবং স্বাধীনতা সংগ্রামীদের যথার্থ স্বপ্ন পূরণের জন্য এ দেশের বর্তমান শাসকদের আদৌ কোনও মাথাব্যথা আছে? তাঁদের হাত ধরে কি নেতাজি সুভাষচন্দ্র

দুয়ের পাতায় দেখুন

বহুজাতিক ওষুধ কোম্পানিগুলির অবাধ লুঠ

মূল্যবৃদ্ধিতে জেরবার সাধারণ মানুষ

করোনা অতিমারির সুযোগ নিয়ে ওষুধের দাম ভয়ঙ্কর হারে বাড়িয়ে দিয়েছে প্রস্তুতকারক কোম্পানিগুলি। অন্যদিকে সরকারি হাসপাতালে কমানো হয়েছে ২৮৩ রকমের ওষুধ। ২০-৩০ শতাংশ, কোনও ক্ষেত্রে ৫০ শতাংশ হারে জীবনদায়ী ওষুধের দামও বাড়ানো হয়েছে, এমনকি নিয়মিত খেতে হয় যে সমস্ত ওষুধ, সেগুলির দামও লাফিয়ে বাড়ছে। করোনায় বন্ধ হয়েছে লক্ষ লক্ষ ছোট-মাঝারি সংস্থা, কাজ চলে গেছে বহু মানুষের। তার উপর ওষুধের মূল্যবৃদ্ধিতে সাধারণ মানুষ আরও বিপাকে পড়েছেন।

সুষম খাদ্যের সুযোগ না পেলেও নিয়মিত ওষুধ খেতে হয় বহু মানুষকে। ক্যান্সার, সুগার, প্রেসার, হার্ট, লিভার, নিউমোনিয়া, কোলেস্টরল, ইউরিন, প্রস্টেট, হাঁপানি, থাইরয়েড, অ্যালার্জি সহ নানা অসুখেই ওষুধ খেতে হয় নিয়মিত। এ ছাড়াও নানা ধরনের অ্যান্টিবায়োটিক, এমনকি গ্যাস-অ্যাসিডিটির জন্য যে ওষুধ মানুষকে

পাঁচের পাতায় দেখুন

ভক্তির ভেকধারী

একের পাতার পর

বসুর স্বপ্নে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা কখনওই সম্ভব? এই মহান বিপ্লবীর স্বপ্ন ছিল শোষণমুক্ত ভারত। তিনি চেয়েছিলেন, এমন নতুন সামাজ যেখানে মানুষের উপর মানুষের শোষণ এবং ধনবৈষম্য থাকবে না। সেই পথেই কি চলছেন নরেন্দ্র মোদিরা? তাঁদের সরকারের সমস্ত নীতি পরিচালিত মুষ্টিমেয় ধনীর কল্যাণে। আজকের ভারতে হাতে গোনা কয়েকজন ধনকুবের ভোগ করে দেশের অধিকাংশ সম্পদ, অন্য দিকে পুঁজিবাদী শোষণে ছিবড়ে হয়ে অধিকাংশ জনগণ তলিয়ে যাচ্ছে অসীম দারিদ্রের খাদে। বর্তমান বিজেপি সরকারের নীতি এই বৈষম্যকে আরও প্রকট করে তুলেছে। নেতাজির মূর্তিতে এই রাষ্ট্রের কর্তারা যত বড় মালা চড়ানই না কেন, এই সমস্যাগুলির সমাধান না করে কি তাঁকে যথার্থ সম্মান প্রদর্শন?

নেতাজির স্বপ্ন ছিল, '... দেশ থেকে সাম্প্রদায়িকতার ক্যানসার নির্মূল করা'। সাম্প্রদায়িকতার ক্যানসার নির্মূল করার চেষ্টা স্বাধীনতার পর থেকে কোনও শাসক দল করেছে? আজকের শাসকদের ভূমিকা কী? তারাই কি এই 'ক্যানসারের' সবচেয়ে বড় বাহক নয়? প্রধানমন্ত্রী নিজে সম্প্রতি উত্তরপ্রদেশে ভোট প্রচারে গিয়ে যে ভাষায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতি নানাভাবে বিষোদগার করেছেন, বিজেপি দলটাই যেভাবে সাম্প্রদায়িকতা এবং সংখ্যালঘু বিদ্বেষের প্রতীকে পরিণত হয়েছে, সত্য বলতে হলে প্রধানমন্ত্রীকে নেতাজির মূর্তির তলায় দাঁড়িয়ে তাঁর দলটিকে ভারতীয় সমাজের 'ক্যানসার' হিসাবে ঘোষণা করতে হত। তিনি কি তা করতে প্রস্তুত? আরএসএস-বিজেপি নেতারা আজ দাবি তুলছেন ভারতকে 'হিন্দু রাষ্ট্র' বানানোর। সেকুলার ভারতকে মুছে ফেলতে তাঁরা বদ্ধপরিকর। সুভাষচন্দ্রের বক্তব্য ঠিক এর বিপরীত। তিনি বলছেন, "... হিন্দুরা ভারতে সংখ্যাগরিষ্ঠ বলে 'হিন্দুরাজের' ধ্বনিশোনা যায়। এগুলি সর্বৈব অলস চিন্তা। ... শ্রমসিক্ত জনসাধারণ যে সব গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সম্মুখীন, সাম্প্রদায়িক সংগঠনগুলি তার কোনওটির সমাধান করিতে পারিবে কি? কী ভাবে বেকারত্ব, নিরক্ষরতা, দারিদ্র প্রভৃতি সমস্যার সমাধান হইবে সে সম্বন্ধে তাহারা কোনও পথনির্দেশ করিয়াছে কি?' (১৪ জুন ১৯৩৮, কুমিল্লায় ভাষণ)

নেতাজির কথায়—'আমাদের দেশের হিন্দু—মুসলমান এই দুই প্রধান সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধের কোনও চিরন্তন কারণ থাকতে পারে না—এটা নেই। ... এক শ্রেণির স্বার্থান্বেষী লোক ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত স্বার্থের লোভে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে কলহ ও মনোমালিন্য সৃষ্টি করে বেড়াচ্ছে... স্বাধীনতা সংগ্রামে এ শ্রেণির লোককেও শত্রু রূপে গণ্য করা প্রয়োজন।"(ওই) তিনি সাম্প্রদায়িকতার প্রচারকদের দেশের শত্রু গণ্য করেছেন। প্রধানমন্ত্রী বলুন—উত্তরাখণ্ডের আপনার দলের ঘনিষ্ঠরা সংখ্যালঘুদের হত্যার ডাক দেওয়ার পর আপনি অথবা অপনার সরকার কি প্রতিবাদ করেছেন? না করে থাকলে, নেতাজি থাকলে আপনাদের কী বলতেন?

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেছেন, তিনি 'ঢাক ঢোল পিটিয়ে' ইতিহাসকে বদলে দিতে চান। বলেছেন, স্বাধীনতা আন্দোলনের 'সঠিক ইতিহাস' তাঁরাই লিখবেন। আসলে তিনি ঢাকা দিতে চাইছেন সেই ইতিহাসকে, যে ইতিহাস তুলে ধরে বিজেপির আদর্শগত অভিভাববক আরএসএস এবং বিজেপি দলটির পূর্বসূরি 'হিন্দু মহাসভা'র স্বাধীনতা সংগ্রামের সাথে বিশ্বাসঘতকতার কর্মকাণ্ডকে। ইতিহাসের পাতায় ধরা আছে এদের যে সব কীর্তি, তাতে স্পষ্ট, আরএসএস-হিন্দুমহাসভার আদর্শ মানলে নেতাজি সুভাষচন্দ্রকে মানা অসম্ভব। স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় আরএসএস চেয়েছে, ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের পরিবর্তে সংগ্রাম হোক মুসলমানের বিরুদ্ধে। তাদের গুরু গোলওয়ালকর তাঁর 'উই অর আওয়ার নেশনহুড ডিফাইন্ড' সহ নানা রচনায় এই কথাই বারবার তুলে ধরেছেন। তাদের অন্যতম আইকন বিনায়ক দামোদর সাভারকর চেয়েছিলেন, ভারতকে ধর্মভিত্তিক জাতিতে বিভক্ত করতে। তিনি উপস্থিত করেছেন, চরম অবৈজ্ঞানিক এবং সাম্প্রদায়িক ধর্মভিত্তিক জাতিতত্ত্বের ধারণা। ইতিহাসবিদ রমেশচন্দ্র মজুমদার দেখিয়েছিলেন, সাভারকরের এই ফরমুলাই পাকিস্তানের দাবিকে জোরদার করতে মুসলিম লিগকে সাহায্য করেছিল।

ইতিহাস দেখিয়েছে, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু যখন আজাদ হিন্দ বাহিনীকে নিয়ে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশের বিরুদ্ধে মরণপণ লড়াইতে নেমেছেন, সেই সময় হেডগেওয়ার, গণেশ দামোদর সাভারকর (বিনায়ক দামোদর সাভারকরের ভাই) প্রমুখ আরএসএস ও হিন্দু মহাসভার নেতারা ব্রিটিশকে সাহায্য করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। হিন্দু মহাসভার নেতা বিনায়ক দামোদর সাভারকর ১৯৪১ থেকে শুরু করে একাধিকবার সওয়াল করেছিলেন, ব্রিটিশের সাহায্যার্থে হিন্দুত্ববাদী মিলিশিয়া বাহিনী গড়ে তুলতে। সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ বাহিনী যখন ব্রিটিশের বিরুদ্ধে লড়ছে, সেই সময় তিনি চাইছেন সুভাষচন্দ্রকে পরাস্ত করতে হিন্দু যুবকরা ব্রিটিশের পাশে দাঁড়াক।

দেশে থাকতেই এদের এই ভূমিকা নিছিলেন নেতাজি। তাই ১৯৪০ সালে ঝাড়গ্রামের ভাষণে তিনি হিন্দু মহাসভাকে 'বিশ্বাসঘাতক' বলে চিহ্নিত করে, তাদের থেকে দেশবাসীকে সাবধান থাকতে বলেছেন। আজ বিজেপির হাতে দেশপ্রেমের ঠিকাদারি দিতে গেলে প্রধানমন্ত্রীকে এই ইতিহাস তো মুছতেই হবে! ইতিহাস বলছে,সাম্প্রদায়িক হিন্দু মহাসভাকে নেতাজি শুধু বিশ্বাসঘাতক নয়, দেশের শত্রু বলছেন— "... আমাদের মনে রাখতে হবে আমাদের শত্রু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এবং যারা সেই সাম্রাজ্যবাদকে সমর্থন করে তারা আমাদের শত্রু এবং ভারতের জাতীয়তার শত্রু। আজকে হিন্দু মহাসভা মোসলেম বিদ্বেষের দ্বারা প্রণোদিত হয়ে অবলীলাক্রমে ইংরাজের সাথে মিলতে পারে, মুসলমানকে জব্দ করতে যেনতেন প্রকারেণ।... মনে রাখতে হবে আমাদের শত্রু হল বিদেশি সাম্রাজ্যবাদ এবং যে সমস্ত ভারতবাসী এবং ভারতীয় প্রতিষ্ঠান তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করে তারাও। (১৫মে ১৯৪০, ২৪ পরগণার যুব সমাবেশে ভাষণ)

প্রধানমন্ত্রীর সুবিধা করে দিয়েছে স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়ে কংগ্রেসের গান্ধীবাদী আপসকামী নেতৃত্ব এবং কমিউনিস্ট বলে দাবি করা অবিভক্ত সিপিআই নেতৃত্বের সুভাষচন্দ্রের প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতার ঘটনা। তিনি এটাকে দেখিয়ে এখন নিজের নেতাজি ভক্তির ভেকটাকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে চাইছেন। এতে তাঁর ভোটপ্রচারের সহায়তা হতে পারে কিন্তু তার সাথে নেতাজির আদর্শের কোনও সম্পর্ক নেই। বরং বলা যেতে পারে, বিজেপি, কংগ্রেস আর মেকি কমিউনিস্ট শক্তি সিপিএম-সিপিআই এরা সকলে নেতাজির প্রতি কতবড় বিশ্বাসঘাতকের ভূমিকা পালন করেছে তারই প্রতিযোগিতা চলছে যেন!

আজকের দিনে নেতাজির স্বপ্ন পূরণের সাথে জড়িয়ে আছে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কর্তব্য পালনের প্রশ্ন। বিজেপির মতো সাম্প্রদায়িক শক্তি তো বটেই, এছাড়াও যারা সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে স্লোগান দেয়, আর ভোটের সময় জাতপাত-ধর্মকে সংকীর্ণ স্বার্থে ব্যবহার করে, এই শক্তিগুলিও আজ নেতাজির প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে পারে না। আজকের ভারতে শোষণহীন নতুন সমাজ গঠনের লড়াইকে বাদ দিয়ে সুভাষচন্দ্রকে যথার্থ শ্রদ্ধা জানানো যায় না। পুঁজিবাদী শোষণ-যন্ত্রকে টিকিয়ে রেখে তার চালক হওয়ার প্রতিযোগিতায় একে অপরের ভোট-প্রতিদ্বন্দ্বী বুর্জোয়া পেটিবুর্জোয়া দলগুলি সকলেই দেশের মানুষের নেতাজির প্রতি আবেগকে পুঁজি করে জনগণের চোখে নিজেদের হীন কার্যকলাপকে আড়াল করতে চায়। তাই এরা নেতাজি-ভক্ত সাজে। যেমন সেজেছেন প্রধানমন্ত্রী।

বিপ্লবী বারীন ঘোষকে লেখা চিঠিতে নেতাজি বলছেন, — "এতকাল স্বাধীনতা বলতে আমরা শুধু রাজনৈতিক স্বাধীনতার কথাই বুঝিয়েছি। কিন্তু এখন থেকে আমাদের ঘোষণা করতে হবে যে, আমরা জনসাধারণকে শুধু রাজনৈতিক দাসত্ব থেকে মুক্ত করতে চাই না, সমস্ত প্রকার বন্ধন থেকেই মুক্ত করতে চাই। স্বাধীনতা সংগ্রামের লক্ষ্য রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক এই তিন ধরনের শোষণেরই অবসান। যখন সকল শৃঙ্খলের অবসান ঘটবে, তখনই আমরা সাম্যবাদের ভিত্তিতে একটি নতুন সমাজ গড়তে অগ্রসর হতে পারি। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রধান লক্ষ্য একটি মুক্ত এবং শ্রেণিহীন সমাজ গড়ে তোলা"। এই স্বপ্নপূরণে ব্রতী হলে তবেই নেতাজির উত্তরসাধক হওয়া সম্ভব। তা তো আর বিজেপি নেতাদের দিয়ে হতে পারে না।

জীবনাবসান

দক্ষিণ ২৪ পরগণার জয়নগর থানার বহড়ুর এস ইউ সি আই (সি) আঞ্চলিক কমিটির সদস্য, বিশিষ্ট সংগঠক কমরেড কমল ভটাচার্য ৩০ ডিসেম্বর হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে কলকাতার পিজি হাসপাতালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৯ বছর। তাঁর মৃত্যুসংবাদ পেয়ে দলের লোকাল কমিটির সকল সদস্য, কর্মী-সমর্থক ও সাধারণ মানুষ তাঁর বাড়িতে যান। মরদেহে মাল্যদান করে বিপ্লবী শ্রদ্ধা জানান জেলা কমিটির পক্ষে রাজ্য ও জেলা কমিটির সদস্য কমরেড সুজাতা ব্যানার্জী ও কমরেড অম্লানকুসুম সরকার। মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে কমরেড সুবোধ ব্যানার্জী, কমরেড ইয়াকুব পৈলান, কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার প্রমুখের সাহচর্যে দলের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ১৯৬০-এর দশকের শেষ ভাগে তিনি দলের সাথে যুক্ত হন। তাঁর বড় গুণ ছিল সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশে সহজ কথায় দলের রাজনীতি বোঝাতে পারতেন। বিশেষ করে মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষের বাড়িতে ছিল তাঁর অবাধ যাতায়াত, ছিলেন তাদের অত্যন্ত আপনজন। এই সময় ডিওয়াইও-র বিশিষ্ট নেতা কমরেড সুধীর ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে বহুড়ু অঞ্চলে ডিওয়াইও সংগঠন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা ছিল সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। ডিওয়াইও-র উদ্যোগে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সাথে নাটক, যাত্রায় তাঁর অভিনয়ের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছে উচ্চস্তরের একজন অভিনেতা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। এ ছাড়া গান লেখা ও সুর দেওয়াও তাঁর বিশেষ দক্ষতা ছিল। এই অঞ্চলের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে তাঁর অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর মৃত্যুতে সাধারণ মানুষ হারালো একান্ত আপনজন, সদাহাস্যময়, উদার মনোভাবাপন্ন এক সক্রিয় সহযোদ্ধাকে।

কমরেড কমল ভট্টাচার্য লাল সেলাম

ওষুধ কমানোর প্রতিবাদ নাগরিক মঞ্চের

মহকুমা ও স্টেট জেনারেল হাসপাতালে ওষুধ কমানোর তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে নাগরিক প্রতিরোধ মঞ্চ। মঞ্চের আহ্বায়ক প্রাক্তন সাংসদ ডাঃ তরুণ মণ্ডল ১৬ জানুয়ারি এক বিবৃতিতে বলেন, সরকারি প্রাথমিক ও মধ্যবর্তী স্তরের চিকিৎসা পরিকাঠামোয় প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, গ্রামীণ হাসপাতালের পর এবার মহকুমা ও স্টেট জেনারেল হাসপাতালেও জরুরি ওষুধের তালিকা ছেঁটে ছোট করে দেওয়া হল। গত ১৫ ডিসেম্বর প্রকাশিত তালিকায় এই দুই ধরনের হাসপাতালে জরুরি ওষুধের তালিকায় ৬৪৪-এর পরিবর্তে ৩৬১ ধরনের ওষুধ রাখা হয়েছে। ক্যান্সার সহ কয়েকটি রোগের বিভিন্ন দামি ওষুধও বাদ পড়েছে। ক্যান্সার রোগের মহার্ঘ ওষুধ, নিউমোনিয়া ভ্যাকসিন, স্ত্রীরোগের একটি ওষুধ, হিমোফিলিয়া রোগের কিছু ওষুধ, অ্যান্টিবায়োটিক খেয়ে অনেকের যে ডায়েরিয়া হয় তার ওষুধ প্রভৃতি বাদ গিয়েছে।

সরকার সহজ রাস্তায় তার ভাবমূর্তিকে উজ্জ্বল করে আগামী নির্বাচনে ফয়দা তোলার লক্ষ্যে যে নানা রকম প্রকল্প নিয়ে এসেছে সেগুলো চালাতে অত্যধিক ব্যয় হচ্ছে। সেগুলো সামাল দিতে গিয়ে হাসপাতালে সরবরাহ করা ওষুধের উপর কোপ পড়েছে। ফলে গরিব মানুষ চিকিৎসা পাবে না। অবিলম্বে এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবি জানান তিনি।

মহান দার্শনিক কার্ল মার্কস ও তাঁর মতবাদ

ভি আই লেনিন

মানবমুক্তির দর্শন হিসাবে মার্কসবাদকে জানতে ও বুঝতে দলের মধ্যে আদর্শগত চর্চার যে ধারাবাহিক প্রক্রিয়া চলছে তার সহায়ক হিসাবে আমরা কার্ল মার্কসের জীবন ও মার্কসবাদ সম্পর্কিত লেনিনের লেখাটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছি। এবার পঞ্চম ও শেষ কিস্তি।

(৫)

সমাজতন্ত্র

উপরের আলোচনা থেকে এ কথা স্পষ্ট, পুঁজিবাদী সমাজ থেকে সমাজতান্ত্রিক সমাজে রূপান্তর যে অবশ্যম্ভাবী, এ সিদ্ধান্ত মার্কস করেছেন সম্পূর্ণ ভাবে এবং কেবলমাত্র সাম্প্রতিক সমাজ বিকাশের অর্থনৈতিক নিয়ম থেকেই। শ্রমের যে সামাজিকীকরণ হাজারো রূপের মধ্য দিয়ে ক্রমাগত দ্রুততর গতিতে এগিয়ে চলেছে এবং মার্কসের মৃত্যুর পর গত অর্ধশতাব্দীতে বৃহদাকার উৎপাদন, পুঁজিপতিদের কার্টেল, সিন্ডিকেট ও ট্রাস্টের বৃদ্ধিতে তথা ফিনান্স পুঁজির পরিমাণ ও ক্ষমতার প্রচণ্ড বৃদ্ধির মধ্যে যা অত্যন্ত স্পষ্ট ভাবে আত্মপ্রকাশ করছে, সেটাই হল সমাজতন্ত্রের অবশ্যম্ভাবী অভ্যুদয়ের প্রধান বস্তুগত ভিত্তি। এ রূপান্তরের বৌদ্ধিক ও নৈতিক চালিকাশক্তি এবং বাস্তব কার্যনির্বাহক হল সর্বহারা শ্রেণি, পুঁজিবাদ নিজেই যাদের শিক্ষিত করে তোলে। বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে সর্বহারা শ্রেণির সংগ্রাম নানা ভাবে এবং উত্তরোত্তর আরও সমৃদ্ধ রূপ নিয়ে অপরিহার্যভাবে পরিণত হয় এক রাজনৈতিক সংগ্রামে, সর্বহারা কর্তৃক রাজনৈতিক ক্ষমতা অধিকার করাই যার লক্ষ্য ('সর্বহারার একনায়কত্ব')। উৎপাদনের সামাজিকীকরণ উৎপাদনের উপকরণগুলিকে সমাজের সম্পত্তিতে পরিণত না করে, 'উচ্ছেদকারীদের উচ্ছেদ' না ঘটিয়ে পারে না। শ্রমের উৎপাদনশীলতার ব্যাপক বৃদ্ধি, শ্রমদিবসের আরও ছোট হওয়া, আদিম ও বিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র উৎপাদনের পড়ে থাকা ধ্বংসাবশেষের জায়গায় যৌথ ও উন্নততর শ্রম—এ সব হল এই পরিবর্তনের প্রত্যক্ষ ফল। পুঁজিবাদ কৃষি ও শিল্পের বন্ধন চূড়ান্তভাবে ছিন্ন করে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তার উচ্চতম বিকাশের মধ্য দিয়ে তা ওইসব বন্ধনের নতুন উপাদান তৈরি করে। বিজ্ঞানের সচেতন প্রয়োগ, যৌথ শ্রমের সমাবেশ এবং জনসংখ্যার পুনর্বিন্যাসের ওপর ভিত্তি করে শিল্প ও কৃষির সংযোগ ঘটায় (এইভাবে গ্রামীণ পশ্চাদপদতা, বিচ্ছিন্নতা ও অজ্ঞতা (বার্বারিজম) এবং বড় শহরগুলিতে বিপুল জনসংখ্যার অস্বাভাবিক কেন্দ্রীভবন—এই দুইয়েরই অবসান ঘটায়। পরিবারের নতুন রূপ, নারীদের সামাজিক মর্যাদা ও নবীন প্রজন্মকে মানুষ করার নতুন শর্তাবলি তৈরি করে আধুনিক পুঁজিবাদের উচ্চতর রূপ ঃ নারী ও অপ্রাপ্তবয়স্কদের শ্রম এবং পুঁজিবাদ কর্তৃক পিতৃতান্ত্রিক পরিবারের ভাঙন বর্তমান সমাজে অনিবার্যভাবেই অতি ভয়াবহ, সর্বনাশা ও জঘন্য রূপ নেয়। কিন্তু তা হলেও 'বৃহৎ শিল্প নারী, তরুণ ও বালক-বালিকাদের ওপর তাদের গার্হস্থ্য জীবনের

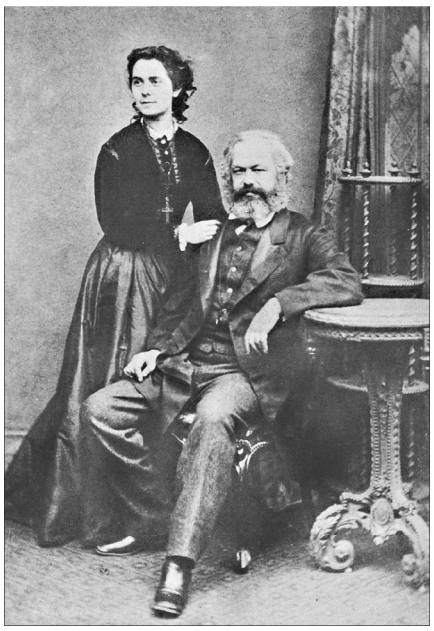

কন্যা জেনি মার্কসের সাথে কার্ল মার্কস

বাইরে সামাজিক ভাবে সংগঠিত উৎপাদন প্রক্রিয়ায় নির্ধারক ভূমিকা অর্পণ করে পরিবার ও নরনারী সম্পর্কের একটা উচ্চতর রূপের নতুন অর্থনৈতিক বনিয়াদ গড়ে তোলে। পরিবারের টিউটনিক-খ্রিস্টান রূপটিকে চরম ও অপরিবর্তনীয় বলে ধরে নেওয়া যতখানি অদ্ভুত, প্রাচীন রোমান, প্রাচীন গ্রিক বা প্রাচ্যের পরিবারের রূপগুলি—একসঙ্গে ধরলে যা ঐতিহাসিক বিকাশের একটি পরম্পরা গঠন করে—তাদের ওপরে ওই একই চরিত্র চাপিয়ে দিলে তা হবে ততখানিই অদ্ভুত। আবার, এ কথা স্পষ্ট যে, উভয় লিঙ্গ ও সমস্ত বয়সের মানুষকে নিয়ে গঠিত যৌথ শ্রমিক গোষ্ঠী, উপযুক্ত পরিস্থিতিতে অবশ্যই মানবিক বিকাশের একটি উৎসে পরিণত হয়, যদিও তা হল স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে বিকশিত, নিষ্ঠুর পুঁজিবাদী বিকাশ যেখানে উৎপাদন প্রক্রিয়ার জন্য শ্রমিকের অস্তিত্ব, শ্রমিকের জন্য উৎপাদন প্রক্রিয়া নয়, যা দুর্নীতি ও দাসত্বের সংক্রামক উৎস' ('পুঁজি', প্রথম খণ্ড, ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদের শেষ)। ফ্যাক্টরি ব্যবস্থায় রয়েছে 'আগামী দিনের শিক্ষার বীজ, যে শিক্ষা একটা নির্দিষ্ট বয়সের পরে সব ছেলেমেয়ের জন্য উৎপাদন-শ্রমের সঙ্গে বিদ্যাশিক্ষা ও শরীরচর্চার মিলন ঘটাবে, এবং তা করবে সামাজিক উৎপাদন বাড়াবার কেবল একটি পদ্ধতি হিসেবেই নয়, সর্বাঙ্গীণ ভাবে বিকশিত মানুষ গড়ে তোলার একমাত্র পদ্ধতি হিসেবেও (ঐ)। মার্কসের সমাজতন্ত্র জাতি ও রাষ্ট্রের প্রশ্নটিকেও একই ঐতিহাসিক ভিত্তিভূমির ওপর দাঁড় করায় শুধু অতীতকে ব্যাখ্যা করার দিক থেকে নয়, বলিষ্ঠতার সঙ্গে আগামী দিনের ভবিষ্যদ্বাণী করতে এবং তা অর্জন করার বলিষ্ঠ বাস্তব ক্রিয়াকলাপের দিক থেকেও। বুর্জোয়া যুগে সমাজ বিকাশের একটি অবশ্যম্ভাবী ফল ও একটি অবশ্যম্ভাবী রূপ হল জাতি। 'জাতির অভ্যন্তরে প্রতিষ্ঠিত না হয়ে', 'জাতীয়' না হয়ে (যদিও কথাটা বুর্জোয়ারা যে অর্থে বোঝে, সেই অর্থে নয়) শ্রমিক শ্রেণির পক্ষে শক্তি সঞ্চয় করা, পরিণত হওয়া, গঠিত হওয়া সম্ভব ছিল না। যদিও পুঁজিবাদের বিকাশ জাতীয় গণ্ডি আরও বেশি করে ভাঙতে থাকে, জাতীয় স্বাতন্ত্র্যের অবসান হয় এবং জাতিতে জাতিতে বৈরিতার বদলে দেখা দেয় শ্রেণি-শত্রুতা। সুতরাং, এগিয়ে-থাকা পুঁজিবাদী দেশগুলির ক্ষেত্রে এ কথা সম্পূর্ণ ভাবে সত্য যে, 'মেহনতিদের কোনও দেশ নেই' এবং অন্তত সভ্য দেশগুলির শ্রমিকদের 'ঐক্যবদ্ধ কাজকর্মই' হল 'সর্বহারার মুক্তির অন্যতম প্রথম শর্ত' ('কমিউনিস্ট ইশতেহার')। রাষ্ট্র, যা হল সংগঠিত নিপীড়ন-ব্যবস্থা, সমাজ বিকাশের একটা নির্দিষ্ট স্তরে অনিবার্য ভাবে তার উদ্ভব হয় যখন সমাজ আপসহীন চিরবিরোধী শ্রেণিতে ভাগ হয়ে পড়ে, যখন বাহ্যত সমাজের ঊর্ধ্বে অবস্থিত এবং সমাজ থেকে কিছু পরিমাণে স্বতন্ত্র একটা 'ক্ষমতা' ছাড়া তা টিকতে পারে না। শ্রেণি-বিরোধের মধ্য থেকে উদ্ভূত হয়ে রাষ্ট্র হয়ে দাঁড়ায় সবচেয়ে শক্তিশালী ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রভুত্বকারী শ্রেণির রাষ্ট্র, যে শ্রেণি রাষ্ট্রের মাধ্যমে রাজনীতির ক্ষেত্রেও আধিপত্যকারী শ্রেণি হয়ে ওঠে এবং এইভাবে নিপীড়িত শ্রেণির দমন ও শোষণের নতুন হাতিয়ার লাভ করে। যেমন, প্রাচীন যুগে রাষ্ট্র ছিল সর্বোপরি ক্রীতদাসদের দমন করার জন্যে দাস-মালিকদের রাষ্ট্র, সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্র ছিল ভূমিদাস ও ক্রীতদাসদের বশে রাখার জন্যে অভিজাত সম্প্রদায়ের সংস্থা এবং আধুনিক প্রতিনিধিত্বমূলক রাষ্ট্র হচ্ছে পুঁজিপতি শ্রেণি কর্তৃক মজুরি-শ্রমিক শোষণের হাতিয়ার' (এঙ্গেলসের লেখা 'পরিবার, ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি', যেখানে তিনি নিজের ও মার্কসের দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থিত করেছেন)। এমনকি, যে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র বুর্জোয়া রাষ্ট্রের সবচেয়ে স্বাধীন ও প্রগতিশীল রূপ সেটিও এই বিষয়টিকে কোনও মতেই পরিহার করতে পারে না, বদলায় শুধু তার চেহারা (সরকার ও স্টক এক্সচেঞ্জের সঙ্গে সম্পর্ক, আমলা ও সংবাদপত্রের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ দুর্নীতি ইত্যাদি)। শ্রেণির বিলোপ ঘটানোর পথে সমাজতন্ত্র রাষ্ট্রেরও বিলোপ ঘটাবে। 'অ্যান্টি-ডুরিং'য়ে এঙ্গেলস লিখেছেন ঃ 'প্রথম যে কাজটির মাধ্যমে রাষ্ট্র নিজেকে সামগ্রিক ভাবে সমাজের প্রকৃত প্রতিনিধি হিসাবে দাঁড় করায়—অর্থাৎ সমাজের নামে উৎপাদনের উপকরণগুলির দখল নেওয়া—একই সঙ্গে তা হয়ে দাঁড়ায় রাষ্ট্র হিসাবে তার শেষ স্বাধীন কাজ। সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ ক্রমেই একের পর এক ক্ষেত্রে অনাবশ্যক হয়ে ওঠে ও তার পরে আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে যায়। মানুষের শাসনের জায়গায় আসে বস্তুর পরিচালনা এবং উৎপাদন প্রক্রিয়ার নিয়ন্ত্রণের অভিমুখ। রাষ্ট্রের 'উচ্ছেদ' হয় না, তা শুকিয়ে মরে যায়' (*এঙ্গেলস, অ্যান্টি ডুরিং, তৃতীয় অধ্যায়, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ*)। 'যে সমাজ উৎপাদনকে সংগঠিত করবে উৎপাদকদের স্বাধীন ও সমান সহযোগের ভিত্তিতে, তা সমগ্র রাষ্ট্রযন্ত্রকে পাঠিয়ে দেবে তার যোগ্য স্থানে ঃ পুরাতত্ত্বের যাদুঘরে, চরকা ও ব্রোঞ্জের কুড়ুলের পাশে' (এঙ্গেলস, 'পরিবার, মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি')।

পরিশেষে, উচ্ছেদকারীদের উচ্ছেদ করার যুগেও যে ক্ষুদ্র চাষিরা থেকেই যাবে, তাদের প্রতি মার্কসের সমাজতন্ত্রের দৃষ্টিভঙ্গির প্রশ্নে এঙ্গেলসের একটি উক্তির উল্লেখ করা প্রয়োজন, যেখানে তিনি মার্কসের মতামত উপস্থিত করেছেন ঃ '...আমরা যখন রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করব, তখন ছোট কৃষকদের জোর করে উৎখাত (ক্ষতিপূরণ সহ বা বিনা ক্ষতিপূরণে) করার কথা আমরা চিন্তাতেও স্থান দেব না, কিন্তু বড়ো বড়ো ভূস্বামীদের বেলায় সেই পথই আমাদের নিতে হবে। ছোট কৃষকদের ক্ষেত্রে আমাদের কর্তব্য হল, প্রথমত, তাদের ব্যক্তিগত উৎপাদন ও ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে সমবায় প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করা, জবরদস্তি করে নয়, উদাহরণ দেখিয়ে এবং এই উদ্দেশ্যে সামাজিক সাহায্যের প্রস্তাব করে। তখন নিশ্চয় ছোট কৃষককে তার ভবিষ্যৎ সুবিধা দেখিয়ে দেওয়ার প্রচুর সুযোগ আমরা পাব, যে সুবিধা এমনকি আজই তার কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠার কথা' (এঙ্গেলস, 'পশ্চিমের কৃষি সমস্যা', 'দি পিজ্যান্ট কোয়েশ্চেন ইন ফ্রান্স অ্যান্ড জার্মানি', আলেক্সেয়েভার প্রকাশন, রুশ অনুবাদে ভুলভ্রান্তি আছে। মূল লেখাটি আছে নিউ জেইৎ পত্রিকায়—জার্মান সোসাল ডেমোক্রেটিক পার্টির একটি তত্ত্বগত সাময়িক পত্রিকা)।

সর্বহারার শ্রেণিসংগ্রামের রণকৌশল

বিপ্লবী কার্যকলাপের ব্যবহারিক দিকটির গুরুত্ব বুঝতে না পারা এবং তার বাস্তব পরিস্থিতি নির্ধারণ করতে না পারাই যে পূর্বতন বস্তুবাদের একটি প্রধান ত্রুটি সেটা ১৮৪৪-১৮৪৫ সালেই মার্কসের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠায় তিনি তাঁর তাত্ত্বিক কাজকর্মের সঙ্গে সঙ্গে সর্বহারার শ্রেণিসংগ্রামের রণকৌশলগত সমস্যাগুলির প্রতিও সারা জীবন অখণ্ড মনোযোগ দিয়ে এসেছেন। এ বিষয়ে বিপুল উপাদান মার্কসের সমস্ত লেখাতেই পাওয়া যাবে, বিশেষ করে পাওয়া যাবে ১৯১৩ সালে চার খণ্ডে প্রকাশিত এঙ্গেলসের সঙ্গে তাঁর পত্রাবলিতে। এই সব উপাদান সংগ্রহ ও সুবিন্যস্ত করা, সেগুলি খুঁটিয়ে দেখা ও বিশ্লেষণের কাজটি বহু বাকি। এ ক্ষেত্রে তাই শুধু সবচেয়ে সাধারণ ও সংক্ষিপ্ত মন্তব্যেই সীমাবদ্ধ থেকে কেবল এইটুকুর ওপর জোর দিতে চাই যে, বস্তুবাদের মধ্যে এই দিকটা না থাকলে মার্কস তাকে ন্যায্যতই গণ্য করতেন আধখেঁচড়া, একপেশে ও নিষ্প্রাণ বলে। সর্বহারা শ্রেণির রণকৌশলের মূল কর্তব্য মার্কস নির্ণয় করেছিলেন তাঁর বস্তুবাদী-দ্বান্দ্বিক বিশ্ববীক্ষার সবকটি মৌলিক নীতির সঙ্গে পূর্ণ সঙ্গতি রেখে। কোনও নির্দিষ্ট সমাজের অগ্রণী শ্রেণির সঠিক রণকৌশল নির্ধারণের ভিত্তি হল, ব্যতিক্রমহীনভাবে সেই সমাজের সকল শ্রেণির পারস্পরিক সম্পর্কের সামগ্রিক যোগফলকে খুঁটিয়ে বিচার করা, পাশাপাশি সেই সমাজের বিকাশের বাস্তব পর্যায় এবং তার সঙ্গে অন্যান্য সমাজের পারস্পরিক সম্পর্কের বিচার। তাতে সমস্ত শ্রেণি ও সকল দেশকে দেখতে হয় স্থিতিশীল ভাবে নয়, গতিশীল ভাবে, অর্থাৎ গতিহীন অবস্থায় নয়, গতির মধ্যে (বিদ্যমান প্রত্যেকটি শ্রেণির অর্থনৈতিক অবস্থার দ্বারা যার নিয়মকানুন নির্ধারিত হয়)। আবার গতিকেও দেখা হয় শুধু অতীতের দৃষ্টিকোণ থেকে নয়, ভবিষ্যতের দৃষ্টিকোণ থেকেও, সেই সঙ্গে তাকে বুঝতে হবে

সাতের পাতায় দেখুন

প্রথম ১০ জন ধনকুবেরের সম্পদে ২৫ বছর বিনামূল্যে স্কুল ও উচ্চশিক্ষা দেওয়া সম্ভব

করোনা অতিমারির সময়ে বিশ্বের ৯৯ শতাংশ মানুষেরই রোজগার কমেছে। নতুন করে ১৬ কোটি মানুষ নেমেছেন দারিদ্রসীমার মধ্যে। অথচ বিশ্বের প্রথম ১০ জন বিত্তশালীর মোট সম্পদ দ্বিগুণেরও বেশি বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১.৫ লক্ষ কোটি ডলার (১১১ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি)। দিনে ৯ হাজার কোটি টাকা করে বেড়েছে তাঁদের সম্পদ। শেষ দু'বছরে তাঁদের সম্পত্তি যা বেড়েছে, তা গত ১৪ বছরেও বাড়েনি। এ তথ্য প্রকাশিত হয়েছে অক্সফ্যাম রিপোর্টে। ভারতের ছবিও আলাদা কিছু নয়। গত দু'বছরে ভারতে বিলিয়ন ডলারের মালিকের সংখ্যা (অন্তত ৭৪০০ কোটি টাকার সম্পদ যাদের) ৩৯ শতাংশ বেড়ে হয়েছে ১৪২ জন। এদের মোট সম্পদ ৫৩ লক্ষ কোটি টাকা। এই ধনকুবেরদের সম্পদ এতটাই বেড়েছে যে, প্রথম ১০ জনের মোট সম্পদ ব্যবহার করলে আগামী ২৫ বছর দেশের স্কুলশিক্ষা এবং উচ্চশিক্ষা দেওয়া যাবে নিখরচায়।

পাড়ার পাঠশালা স্কুলের বিকল্প হতে পারে না

একের পাতার পর

অভিভাবকরা তা কিছুতেই মেনে নেবেন না। তাই সর্বত্র আজ স্লোগান উঠেছে, 'মাঠে ঘাটে পাড়ায় নয়, ক্লাসরুমে শিক্ষা চাই', 'গ্রামে-শহরে আওয়াজ তোলো, বন্ধ স্কুলের তালা খোলো'।

স্কুল খোলার দাবিতে ছাত্র সংগঠন এআইডিএসও, প্রাথমিক শিক্ষক সংগঠন বিপিটিএ, হাইস্কুল শিক্ষক সংগঠন, মহিলা সংগঠন এআইএমএসএস, অল বেঙ্গল সেভ এডুকেশন কমিটি সহ বিভিন্ন সংগঠন রাস্তায় নেমেছে। সব কিছু খোলা যাবে, অথচ স্কুল খোলা যাবে না— কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের এই অদ্ভুত মনোভাবের তীব্র বিরোধিতা করে ১৯ জানুয়ারি এস ইউ সি আই(সি) রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য এক বিবৃতিতে বলেন, 'রাজ্য সরকারের সাম্প্রতিক নির্দেশে বিয়েবাড়ি সহ সামাজিক অনুষ্ঠানের জমায়েতের সংখ্যা বাড়িয়ে ২০০ জন করা হয়েছে, মেলা, যাত্রা চলছে, জিম, সিনেমা, পানশালা, রেস্তোঁরা, শপিংমল সব খোলা। অথচ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খোলার উপর নিষেধাজ্ঞা জারিই থাকছে। স্কুলগুলি প্রায় দু'বছর বন্ধ। এর ফলে রাজ্যে শিক্ষার ভীষণ ক্ষতি হচ্ছে, শিশুশ্রম ও বাল্যবিবাহ বাড়ছে, ছাত্ররা মানসিক রোগের শিকার হচ্ছে। বিভিন্ন জেলায় শিক্ষকরা নিজস্ব উদ্যোগে অফলাইনে ক্লাস নিচ্ছেন যা অভিভাবকদের সম্মতি ছাড়া সম্ভব হত না। রাজ্যের একটি লোকসভা কেন্দ্রে যদি ৫৩ হাজারের বেশি নাগরিকের টিকাকরণ সম্ভব হয় তা হলে সরকারের সদিচ্ছা থাকলে যে বয়সের ছাত্রছাত্রীরা টিকা পেতে পারে তাদের সকলকে অতি স্বল্প সময়ের মধ্যে টিকার ব্যবস্থা করা যায়। এই পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্য সরকারের কাছে টিকাকরণের ব্যবস্থা করে কোভিড বিধি মেনে সমস্ত স্তরেই অতি দ্রুত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খোলার দাবি জানিয়েছেন তিনি।

সেভ এডুকেশন কমিটির প্রতিবাদ ঃ অতি দ্রুত স্কুল খোলার বিষয়ে অল বেঙ্গল সেভ এডুকেশন কমিটির সম্পাদক অধ্যাপক তরুণকান্তি নস্কর বলেন, ফেব্রুয়ারি মাসের মিড-ডে মিল দেওয়ার নোটিশ থেকে স্কুল খোলার ভবিষ্যৎ নিয়ে অভিভাবকদের মধ্যে সন্দেহ আরও দানা বেঁধেছে। সরকারের এই দৃষ্টিভঙ্গি শিক্ষার প্রভূত ক্ষতি করলেও বাইজুস ও টিউটোপিয়ার মতো নানা অনলাইন শিক্ষা-অ্যাপ, যার সঙ্গে কেন্দ্র ও রাজ্যের প্রভাবশালীরা যুক্ত, তাদের ব্যবসায় সাহায্য করবে। এই অ্যাপনির্ভর শিক্ষা ক্রমশএ ব্যয়বহুল হবে, যার ফলে আগামী দিনে গরিব-নিম্নবিত্ত-মধ্যবিত্ত সহ জনসংখ্যার ৯০ ভাগেরও বেশি শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে। এটা মানুষ মেনে নিতে পারেন না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রেখে অ্যাপ-নির্ভর অনলাইন শিক্ষা ব্যবসার তীব্র বিরোধিতা করেন তিনি। অল বেঙ্গল সেভ এডুকেশন কমিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি দ্রুত খোলার দাবিতে ২৭ জানুয়ারি রাজ্যজুড়ে বিক্ষোভ, ধর্না, পদযাত্রা, সই-সংগ্রহ এবং মুখ্যমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীকে স্মারকলিপি পাঠানোর কর্মসূচি পালন করেছে।

সিউড়িতে স্কুলের বাইরে চলছে পড়াশোনা

এআইডিএসও-র দাবি ঃ এ আই ডি এস ও-র রাজ্য সভাপতি সামসুল আলম ও রাজ্য সম্পাদক মণিশঙ্কর পট্টনায়ক জানান, ২০-২১ জানুয়ারি সংগঠনের পক্ষ থেকে রাজ্য জুড়ে স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় খোলার দাবিতে বিক্ষোভ হয়েছে। সমস্ত জেলা শহর, মহকুমা, ব্লক স্তরে ছাত্ররা স্কুল খোলার দাবিতে পথে নেমেছে। ছয়-সাত মাস আগে থেকেই স্কুল খোলার দাবিতে রাজ্যজুড়ে আন্দোলনে নেমেছে এআইডিএসও।

বিপিটিএ ঃ প্রাথমিক শিক্ষক সংগঠন বিপিটিএ ১৭-২৩ জানুয়ারি সারা বাংলা প্রতিবাদ সপ্তাহে, 'চলো স্কুলে পড়াই' কর্মসূচি পালন করেছেন। বিভিন্ন স্কুল মাঠে, গাছতলায়, ক্লাবে তারা প্রকাশ্যে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে ক্লাস করে স্কুল খোলার জরুরি প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেছেন।

এআইএমএসএস ঃ স্কুল খোলার দাবিতে ২৮ জানুয়ারি রাজ্যজুড়ে বিক্ষোভ, পদযাত্রায় সামিল হয় অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠন। 'আমরা স্কুলে যেতে চাই' পোস্টার নিয়ে মায়েদের সাথে শিশুদের অংশগ্রহণ দাবির মাত্রা বাড়িয়েছে। এর পরেও সরকারের কানে জল না ঢুকলে আন্দোলন তীব্র হবে বলে জানান নেতৃবৃন্দ।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খোলার দাবিতে রাজ্য জুড়ে সোচ্চার এআইডিএসও

ছাত্র-ছাত্রীদের দ্রুত ভ্যাকসিন দিয়ে অবিলম্বে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলার দাবিতে এবং শিক্ষা ধ্বংসের নীল নক্সা জাতীয় শিক্ষানীতি-২০২০ বাতিলের দাবিতে ২০-২১ জানুয়ারি রাজ্য জুড়ে অবস্থান বিক্ষোভের কর্মসূচি পালন করে এআইডিএসও। প্রথম দিন স্কুল ছাত্রছাত্রীদের, শিক্ষকদের, অভিভাবকদের নিয়ে বিক্ষোভ সংগঠিত হয়। পূর্ব মেদিনীপুরের কাঁথি থেকে কোচবিহারের হলদিবাড়ি, বীরভূমের রামপুরহাট থেকে দক্ষিণ ২৪ পরগনার জামতলা, দার্জিলিংয়ের শিলিগুড়ি থেকে কলকাতার কলেজ স্ট্রিট—সর্বত্রই ছাত্রছাত্রীরা, বিশিষ্ট শিক্ষক, শিক্ষাব্রতী মানুষ, অভিভাবকদের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়। 'আমরা স্কুলে যেতে চাই' প্ল্যাকার্ড হাতে নিয়ে ছাত্রছাত্রীরা এই অবস্থান বিক্ষোভে তাদের অনুভূতি ব্যক্ত করে। স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা বিগত দুই বছরের ক্লাসরুমবিহীন জীবনের নানা মুহূর্ত বক্তব্য ও চিত্রাঙ্কনের মধ্যে দিয়ে তুলে ধরেন। কেউ কেউ অনলাইন শিক্ষার সুযোগ থেকে কীভাবে বঞ্চিত হচ্ছেন এবং তার প্রভাব তাদের জীবনে কেমন করে পড়ছে তা বিস্তারিত তুলে ধরেন তাদের বক্তব্যে। সকলেই দ্রুত ক্লাস রুম পঠনপাঠন শুরুর জন্য সোচ্চার হন।

যাদবপুরে এআইডিএসও-র প্রতিবাদ মিছিল

হাজরায় অবস্থান বিক্ষোভ

কলকাতায় কলেজ স্ট্রিটে অনুষ্ঠিত বিক্ষোভ সভার পাশে দাবির সমর্থনে একটি 'গণতান্ত্রিক বোর্ডের' উদ্বোধন করেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক কমরেড মণিশঙ্কর পট্টনায়ক। তিনি বোর্ডে প্রথম স্বাক্ষর করে মন্তব্য করেন, 'পড়ার জন্য লড়তে হবে স্বাধীন ভারতে, বাস্তবিকই, সরকার স্কুল খোলায় টালবাহানা করছে, ছাত্ররা লড়ছে খোলার দাবিতে। এ দৃশ্য অভাবনীয়।

বিক্ষোভ সভায় তিনজন ক্ষুদে পড়ুয়াকে দেখে এক সাংবাদিক তির্যক প্রশ্ন করলে তাদের অভিভাবকরাই স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে জবাব দেন 'আমাদের সন্তানের ভবিষ্যতের জন্য আমরা নিজেরাই তাদের এই কর্মসূচিতে এনেছি।' নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর সদরে অনুষ্ঠিত বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন সংগঠনের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সভাপতি কমরেড সামসুল আলম। তিনি বলেন, 'জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০'-র মধ্যে দিয়ে গোটা শিক্ষাব্যবস্থার যে চূড়ান্ত বেসরকারিকরণ করতে চাইছে কেন্দ্রের মোদী সরকার, মুখে বিরোধিতার কথা বললেও আদতে তারই বাস্তবায়ন করতে চাইছে এ রাজ্যের সরকার।

২১ জানুয়ারি রাজ্যের কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় সহ মেডিক্যাল, ইঞ্জিনিয়ারিং, আইন ইত্যাদি পেশাগত কোর্সের পড়ুয়াদের নিয়ে অবস্থান বিক্ষোভের কর্মসূচি পালিত হয়। এদিন মুর্শিদাবাদের বহরমপুরে দলদাস পুলিশ মাইক লাগিয়ে কর্মসূচি করতে বাধা দিলে সংগঠনের কর্মীরা তৎক্ষণাৎ রাস্তায় ব্যারিকেড গড়ে খালি গলায় বক্তব্য রেখে প্রতিবাদ ধ্বনিত করেন। কলকাতার যাদবপুরে বিক্ষোভ সভা চলাকালীন অংশগ্রহণকারী এক ছাত্র প্রতিবাদের অনুষঙ্গ হিসেবে দাবির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি ছবি আঁকেন। কলেজ স্ট্রিটে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ফটকের সামনে অনুষ্ঠিত সভায় কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র অনলাইন মাধ্যমে মেডিক্যাল শিক্ষা কী ভয়াবহ বিপদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে তা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, 'আমাদের সেকেন্ড ইয়ারে যে কোর্সের সময়সীমা দেড় বছর তা মাত্র ৪ মাসে শেষ করে ফেলা হয়েছে এই অনলাইন জমানায়।' যাদবপুরে অনুষ্ঠিত সভায় এক গবেষক বিগত দুই বছরে গবেষণা খাতে কী পরিমাণ ব্যয়বরাদ্দ কমেছে তার পরিসংখ্যান তুলে ধরেন। এদিন হুগলির শ্রীরামপুরে পথনাটিকার মাধ্যমে স্কুল খোলার দাবি তুলে ধরা হয়। সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক মণিশংকর পট্টনায়ক বলেন, অবিলম্বে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলার ঘোষণা না হলে বৃহত্তর আন্দোলন হবে।

ওষুধ কমানোর প্রতিবাদ

একের পাতার পর

কোলাঘাট ঃ ওষুধ কমানোর প্রতিবাদে এবং ব্লকের স্বাস্থ্য পরিকাঠামো উন্নয়নের দাবিতে ১৯ জানুয়ারি সারা বাংলা হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা সংগঠন এবং প্রোগ্রেসিভ মেডিকেল প্র্যাকটিশনার্স অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ার কোলাঘাট ব্লক কমিটির উদ্যোগে বিএমওএইচ-এর কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। প্রতিনিধি দলে ছিলেন সংগঠনের সভাপতি ডাঃ মোজাফফর আলি খান, যুগ্ম সম্পাদক ডাঃ অর্জুন ঘোড়ই ও দিলীপ মাইতি প্রমুখ। একই দাবিতে এস ইউ সি আই (সি)-র কোলাঘাট ব্লক কমিটির উদ্যোগে বিবেকানন্দ মোড় থেকে বিক্ষোভ মিছিল করে ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

বহুজাতিক ওষুধ কোম্পানিগুলির অবাধ লুঠ

একের পাতার পর

খেতে হয় অহরহ, সেগুলির দামও বেড়ে চলেছে চড়া হারে। এমনকি করোনা কালে প্যারাসিটামল, ভিটামিন সি-র মতো ওষুধেরও দাম বাড়ানো হয়েছে যথেচ্ছ, কোথাও কোথাও সেগুলি উধাও হয়ে যাচ্ছে বাজার থেকে। করোনার নির্দিষ্ট কোনও ওষুধ না থাকলেও ডাক্তারদের পরামর্শ মতো কিছু ওষুধ সাধারণ মানুষ ব্যবহার করছেন। জনসাধারণের অতিমারি আতঙ্কের সুযোগ নিয়ে সে সমস্ত ওষুধের দাম এক ধাক্কায় বাড়ানো হয়েছে অনেকখানি। ওষুধের দোকানে গিয়ে সাধারণ মানুষ সর্বস্বান্ত হয়ে ফিরে আসছেন। পথ্যের জোগাড় দূরের কথা, বহু মানুষই ওষুধ খাওয়া ছেড়ে 'ভাগ্যের' হাতে নিজেকে সঁপে দিতে বাধ্য হচ্ছেন।

তাতে আবার মরার উপর খাঁড়ার ঘা। সরকারি হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যেটুকু ওষুধ পাওয়া যেত, তার মধ্যে ২৮৩ রকমের ওষুধ কমিয়ে দিয়েছে রাজ্যের তৃণমূল সরকার। এতদিন পর্যন্ত অত্যাবশ্যকীয় ওষুধের তালিকায় ৬৪৪টি ওষুধ সরবরাহ করা হত, তা কমিয়ে ৩৬১ করা হয়েছে। তালিকা থেকে ক্যান্সার, ডায়াবেটিস, নিউমোনিয়া সহ বহু গুরুত্বপূর্ণ রোগের চিকিৎসায় অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একাধিক ওষুধ এবং একই ওষুধের বিভিন্ন মাত্রা বাদ দেওয়া হয়েছে। এর তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে এসইউসিআই(সি)-র রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ১৬ জানুয়ারি মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছেন। এর বিরুদ্ধে দলের উদ্যোগে জেলায় জেলায় ডাক্তার-স্বাস্থ্যকর্মী-রোগীর পরিজন এবং সাধারণ মানুষকে নিয়ে আন্দোলন সংগঠিত হচ্ছে। কিন্তু কা কস্য পরিবেদনা! সরকার ও বেসরকারি ওষুধ কোম্পানির দুষ্টচক্রের হাতে পড়ে সাধারণ মানুষের জীবন হয়ে উঠেছে দুর্বিষহ।

ওষুধের দামের ওপর নিয়ন্ত্রণ তুলে দিয়ে বেসরকারি ওষুধ কোম্পানিগুলিকে বিপুল মুনাফার সুযোগ করে দিচ্ছে বিজেপি সরকার, যার শিকার হতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। ফার্মা কোম্পানিগুলি ওষুধের দাম বৃদ্ধির পক্ষে যুক্তি দিচ্ছে জিএসটি (গুডস অ্যান্ড সার্ভিস ট্যাক্স) বেড়েছে । ৫-১২, কোথাও ১৮ শতাংশ, এমনকি ২৮-ও বেড়েছে কোনও কোনও ক্ষেত্রে। তাই তাদের নাকি লাভ হচ্ছে না। বাস্তবটা হল, কোনও কোনও ওষুধে সরকার চড়া জিএসটি চাপালেও ওষুধ কোম্পানিগুলির অতি মুনাফাই এই বিরাট মূল্যবৃদ্ধির কারণ। ন্যাশনাল ফার্মাসিউটিক্যাল প্রাইসিং অথরিটি অতি চলতি কিছু ওষুধের দাম ৫০ শতাংশ পর্যন্ত বাড়ানোর অনুমতি দিয়েছে। তার মাশুল গুনতে হচ্ছে হতদরিদ্র মানুষকেও। এই সুযোগে বেসরকারি ওষুধ কোম্পানিগুলি দু'হাতে লুটছে জনসাধারণের টাকা। তাদের মুনাফার পাহাড় বাড়ছে। প্রশ্ন হল, ওষুধের মতো জীবনদায়ী জিনিসে, এমনকি করোনা অতিমারির সময়ে এমন বেলাগাম দাম বাড়াতে পারে কী করে বিজেপি সরকার? এ থেকেই স্পষ্ট, জনসাধারণ নয়, একচেটিয়া পুঁজিপতিদের প্রতিই তাদের দায়বদ্ধতা। তাই সরকারি সংস্থাগুলিকে বঞ্চিত করে বেসরকারি সংস্থাগুলিকে সরকার ওষুধ তৈরির বরাত দিচ্ছে।

দেশের সর্ববৃহৎ সরকারি ওষুধ সংস্থা আইডিপিএল রয়েছে হৃষিকেশ, হায়দরাবাদে এবং গুরগাঁও-এ। ১৯৬১ সালে প্রতিষ্ঠিত কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন এই সংস্থা একসময় অন্যান্য কোম্পানির 'রোল-মডেল' ছিল। পুনেতে রয়েছে ১৯৫৫-তে প্রতিষ্ঠিত হিন্দুস্তান অ্যান্টিবায়োটিকস লিমিটেড (হ্যাল)। রয়েছে ১৯৪১-এ গঠিত বেঙ্গল কেমিকেল অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যাল লিমিটেড (বিসিপিএল)। এগুলি সবই গুরুত্বপূর্ণ সরকারি সংস্থা, যেগুলির অধীনে রয়েছে নানা সাবসিডিয়ারি সংস্থা। বেসরকারি সংস্থা বেঙ্গল ইমিউনিটি লিমিটেড রুগ্ন হয়ে পড়ায় ১৯৮৪-তে কেন্দ্রীয় সরকার অধিগ্রহণ করে। এ ছাড়াও বহু বেসরকারি ওষুধ কোম্পানি রুগ্ন হয়ে পড়ায় সরকার অধিগ্রহণ করেছে। সেগুলিতে ওষুধ উৎপাদন হলে খরচ কম পড়ত, মূল্যও কম হত। সাধারণ মানুষের আয়ত্তের মধ্যে থাকত ওষুধের দাম। কিন্তু কর্পোরেটপ্রেমী সরকার সান ফার্মা, রেড্ডি ল্যাবরেটরি, সিপলা, টরেন্ট, অরবিন্দ, অ্যাবট, লুপিন ইত্যাদি বহুজাতিক ওষুধ কোম্পানির লাভের সুযোগ করে দিচ্ছে। ঠিক একইরকম ভাবে সরকারি টিকা প্রস্তুতকারী ১৪টি সংস্থাকে বঞ্চিত করে মাত্র দু'টি বেসরকারি সংস্থাকে কোটি কোটি ডোজ ভ্যাকসিনের বরাত দিয়ে তাদের বিপুল মুনাফার সুযোগ করে দিচ্ছে। এদের সাহায্য করতে কি কংগ্রেস, কি বিজেপি সরকার তাদের ওষুধ- নীতি নির্ধারণ করছে। ওষুধের দামের উপর তাদের কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই।

কর্পোরেট ওষুধ কোম্পানিগুলির মুনাফা বাড়াতে সরকারের এত তৎপরতা কেন? এই সব একচেটিয়া কোম্পানিগুলির সাথে সরকার তথা শাসক দলগুলির যে যোগসাজশ, পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং লেনদেন—তারই ফল এটি। পুঁজিবাদী এই রাষ্ট্রে পুঁজিমালিকদের নেকনজরে থাকতে পারলে তবেই সরকারে বসার সুযোগ পায় ক্ষমতালোভী রাজনৈতিক দলগুলি। না হলে নয়। তাই একে অপরের স্বার্থ দেখে এরা।

শরৎসাহিত্যের গভীরতাকে যখন আমি দ্বিতীয়বার অনুভব করতে পারলাম

বিষ্ণু প্রভাকর

শরৎচন্দ্রকে বলা হয় নারীর ত্রাতা। এ কথাটার তাৎপর্য বুঝতে পারব যদি নিজেকে শরৎ-যুগে নিয়ে গিয়ে পূর্বধারণামুক্ত দৃষ্টিতে দেখার চেষ্টা করি। এসইউসিআই-এর প্রতিষ্ঠাতা শিবদাস ঘোষ শরৎ-সাহিত্য শুধু পড়েছিলেন তা-ই নয়, তিনি তার মর্মবস্তু উপলব্ধি করেছিলেন। শুধু 'সারা বাংলা শরৎ শতবার্ষিকী কমিটি' নয়, এই দলটি 'সারা ভারত শরৎ শতবার্ষিকী কমিটি'ও গড়ে তুলেছিল। এরা গোটা দেশে ঘুরে ঘুরে প্রবল উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে নানা কর্মসূচি পালন করেছে। এই কমিটির সাথে আমি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলাম। বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল) সারা বাংলা কমিটির সভাপতি ছিলেন। সারা ভারত কমিটির সভাপতি ছিলেন প্রখ্যাত গুজরাতি কবি উমাশঙ্কর যোশী। এছাড়া, দু'জন সম্পাদক ছিলেন মানিক মুখোপাধ্যায় আর আমি। এই কমিটিতে বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট হিন্দি লেখক ছিলেন। তাঁদের মধ্যে বিশেষ করে মহাদেবী বর্মার নাম উল্লেখ করতে চাই। তিনি ছিলেন শরৎচন্দ্রের অন্যতম গুণমুগ্ধ। সম্পাদক হিসেবে আমাকে প্রায় সারা ভারতেই ঘুরতে হয়েছে। যেন তখন আমার পায়ে পাখনা গজিয়েছিল, আর তাতে ভর করে আমি বছর দুয়েক সারা দেশে উড়েই যাচ্ছিলাম। ঘোরা মানে তো শুধু ঘোরা না, বক্তৃতাও করতে হত। আমি প্রায় চোদ্দ বছর নিরন্তর গবেষণা করে শরৎচন্দ্রের জীবনী 'আওয়ারা মসীহা' লিখেছিলাম। সেটা ১৯৭২ সালে দিল্লির 'সাপ্তাহিক হিন্দুস্তান' এবং ১৯৭৩ সালে কালিকট নগরের সাপ্তাহিক 'জীবন প্রভাত'-এ বেরনো শুরু হয়েছিল। ওই দুটো বছরে আমি যেখানেই যেতাম লোকজন সাদর অভ্যর্থনা জানাত এবং প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতো। আমি অপার বিস্ময়ে ভাবতাম, বাংলার এক ছোট্ট গ্রামের এক অখ্যাত লেখক কী ভাবে সারা দেশকে অভিভূত করে দিয়েছে, আপন করে নিয়েছে, প্রমাণ করে দিয়েছে যে, দেশকে ঐক্যবদ্ধ করে তোলার শক্তি আছে সাহিত্য-সংস্কৃতিরই। পশ্চিমবঙ্গ সরকারও শরৎ-জয়ন্তী আয়োজন করেছিল। প্রদর্শনী হয়েছিল, বাংলার বিশিষ্ট লেখক, সমালোচক, ইতিহাসবিদ বক্তব্য রেখেছিলেন। ডক্টর সুকুমার সেন, যিনি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস লিখেছেন, শরৎচন্দ্রকে উচ্চস্থান দেননি। কিন্তু আমার বক্তৃতার পর উনি খুব সহজভাবে হাসিমুখে বললেন, 'সত্যিই কি এদেশের মানুষ শরৎচন্দ্রকে এত ভালোবাসে?' আমি বলেছিলাম, 'আজ্ঞে হ্যাঁ। সারা দেশে যে এত আয়োজন অনুষ্ঠান হচ্ছে সেগুলোই তার প্রমাণ নয়?'

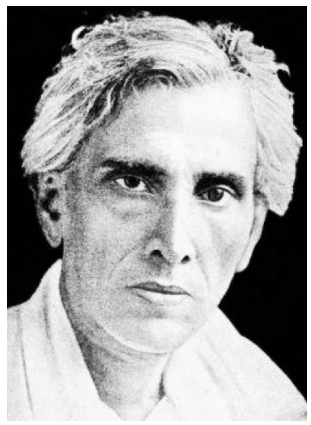

কমিটির কাজে নানা জায়গায় গিয়ে শরৎবাবু সম্পর্কে অনেক নতুন তথ্য পেয়েছি। যেমন, ১৯২৫ সাল নাগাদ ওনার কিছু লেখা গুজরাতি ভাষায় প্রথম অনুবাদ করেছিলেন মহাদেব দেশাই, স্বয়ং মহাত্মা গান্ধীর অনুরোধে। সেগুলো ছিল বিরাজ বৌ, রামের সুমতি, বিন্দুর ছেলে এবং মেজদিদি। এসইউসিআই-এর সংস্পর্শে না এলে শরৎচন্দ্রকে পুনরায় গভীরভাবে বুঝতে পারতাম না। ওনার আত্মীয়দের সাথেও পরিচিত হতে পেরেছি। ওনার এক ভাইঝির সঙ্গে ভাগলপুরের বাঙালিটোলায় ফের দেখা হল। তাঁর অশেষ শ্রদ্ধায় আমি মুগ্ধ। ওখানে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন বিরাট আয়োজন করেছিল। মনে হচ্ছিল পুরো শহরটা যেন শরৎময় হয়ে উঠেছে।

(উত্তরপ্রদেশের 'অমর উজালা' দৈনিকে প্রকাশিত ২২ জানুয়ারি ২০২২)

বিষ্ণু প্রভাকর (১৯১২-২০০৯) হিন্দি ভাষার প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও প্রবন্ধকার। হরিয়ানার সাহিত্য অ্যাকাডেমি পুরস্কার সহ বহু পুরস্কারে ভূষিত। তিনি শরৎ জন্মশতবর্ষে সর্বভারতীয় উদযাপন কমিটির যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন। শরৎ-জীবনীকার হিসাবে তিনি বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করেন। তাঁর লেখা ওই জীবনী গ্রন্থটি 'ছন্নছাড়া মহাপ্রাণ' হিসাবে বাংলায় প্রকাশিত হয়।

উত্তরাখণ্ড বিধানসভা নির্বাচনে এসইউসিআই(সি)

উত্তরাখণ্ডে শ্রীনগর বিধানসভা কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে এস ইউ সি আই (সি)। দলের রাজ্য ইনচার্জ কমরেড মুকেশ সেমওয়াল জানান, কমরেড সন্দীপ কুমার এই কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। কমরেড কুমার শ্রীনগরের এইচ এন বি কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে এআইডিএসও-র নেতা। তিনি করোনা অতিমারি পর্বে আক্রান্তদের ত্রাণ ও সেবামূলক কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। কর্পোরেটপন্থী কৃষি আইন বাতিলের দাবিতে বর্ষব্যাপী দিল্লির কৃষক আন্দোলনে তিনি সিঙ্গু বর্ডারে স্বেচ্ছাসেবকের ভূমিকা পালন করেছেন। কমরেড সেমওয়াল জানান, ৭-৮ বছর আগে এই রাজ্যে এসইউসিআই(সি)-র সাংগঠনিক কাজ শুরু হয়। ইতিমধ্যে বিভিন্ন জেলায় দলের বিস্তৃতি ঘটেছে। পুঁজিপতিদের বিশ্বস্ত দল বিজেপি ও কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সংগ্রামী বামপন্থার ভিত্তিতে এস ইউ সি আই (সি) নির্বাচনে প্রচার চালাচ্ছে।

২৩-২৪ ফেব্রুয়ারি ভারত বনধের সমর্থনে

পাঠকের মতামত

গরিব মেরে ধনকুবেরদের অবাধ লুঠ

সম্প্রতি দাভোসে ওয়ার্ল্ড ইকনমিক ফোরামের সম্মেলনে আন্তর্জাতিক সমীক্ষা সংস্থা অক্সফ্যামের পেশ করা রিপোর্টে যে চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এসেছে তা এক কথায় ভয়ঙ্কর বললে কম বলা হয়। গত কয়েক দশক ধরে সারা বিশ্ব তথা ভারতবর্ষে নিরন্ন মানুষের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছিল। কলকারখানায় লকআউট, ছাঁটাইয়ের ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ কর্মচ্যুত হচ্ছিল। বিনা চিকিৎসায় মরছিল হাজারে হাজারে অসহায় মানুষ। করোনা অতিমারির আগেই বেকারত্ব এমন পর্যায়ে পৌছায় যেখানে সামান্য ডোমের একটি চাকরির জন্য উচ্চ শিক্ষিত এমনকি পিএইচডি হোল্ডাররা পর্যন্ত কয়েক হাজার শিক্ষিত যুবক লাইনে দাঁড়াচ্ছিলেন। করোনা বড়ে এই দুবছরেই সেই করুণ চিত্রটাকে আরও ভয়ঙ্কর করে তুলেছে।

অক্সফ্যামের রিপোর্ট বলছে, এই দুবছরে সারা বিশ্বে ৯৯ শতাংশ মানুষের রোজগার কমেছে। ১৬ কোটির উপরে মানুষ দারিদ্রসীমার নিচে চলে গেছে। ভারতবর্ষেও কোটি কোটি অসংগঠিত ও সংগঠিত ক্ষেত্রের মানুষ কর্মচ্যুত হয়েছে। করোনা কালে দেশে দশ হাজার চুরানব্বই জন শিশু বাবা-মা দুজনকেই হারিয়েছে। এক লক্ষ ছত্রিশ হাজার ন'শো দশ জন শিশু বাবা কিংবা মা-কে হারিয়েছে। পরিবারের সাথে রাস্তায় থাকে ৫৪০১ জন শিশু এবং ৪১৪৮ জন শিশু একাই সারাদিন রাস্তায় কাটায়। কী ভয়ঙ্কর এই চিত্র। অক্সফ্যামের রিপোর্টে এই চিত্র উঠে এসেছে। আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা এর চেয়েও আরও বেশি শিশু এই মুহূর্তে রাস্তায় থাকে। করোনার প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় ঢেউ এভাবেই এদেশের দারিদ্রকে আরও ভয়ঙ্কর করে তুলেছে। এ তথ্যও আজ উঠে আসছে, করোনাকালে অসংখ্য মানুষ করোনা এবং করোনা বর্হিভূত কারণে কার্যত বিনা চিকিৎসায় মারা গেছে। সরকার সংক্রমণ এবং সে কারণে মৃত্যুর তথ্য চেপে দেওয়ার পরেও সিভিল রেজিস্ট্রেশনের রিপোর্ট দেখলে বোঝা যায় করোনার আগের বছরে যত মানুষের মৃত্যু হয়েছিল, ২০২০ সালে সেই মৃত্যুপঞ্জিতে যুক্ত হয়েছে কম করে পাঁচ গুণ বেশি মানুষের সংখ্যা।

অক্সফ্যামের রিপোর্ট বলছে করোনা কালে ভারত সরকার স্বাস্থ্য বাজেট কমিয়েছে দশ শতাংশ । স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সামাজিক সুরক্ষায় পর্যাপ্ত খরচ না করা এবং স্বাস্থ্য ও শিক্ষার বেসরকারিকরণের জন্যই করোনা অতিমারির মধ্যে দরিদ্র মানুষের পক্ষে বড়সড়ো ব্যাধির মোকাবিলা করা কঠিন হয়ে পড়ছে। কার্যত অপর্যাপ্ত স্বাস্থ্য পরিকাঠামো, জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা সেভাবে গড়ে না তোলা এবং কর্পোরেটমুখী ও বিমামুখী স্বাস্থ্যনীতির জন্যই সারা দেশ জুড়ে করোনা আক্রান্ত মানুষ বিনা অক্সিজেনে, বিনা চিকিৎসায় হাজারে হাজারে মারা গেছে। গণচিতা জ্বলেছে রাজ্যে রাজ্যে। লাশ ভেসে গেছে নদীর জলে।

আবার পাশাপাশি এই রিপোর্টই বলছে, করোনাকালে ভারতে বিলিয়ন ডলারের (অন্তত ৭৪০০ কোটি টাকা) মালিকের সংখ্যা ৩৯ শতাংশ বেড়ে হয়েছে ১৪২। তাদের সম্পদ দ্বিগুণের বেশি বেড়ে হয়েছে ৫৩ লক্ষ কোটি টাকা। সম্পদের নিরিখে ১০ শতাংশ মানুষের হাতে রয়েছে জাতীয় সম্পদের ৪৫ শতাংশ। আর নিচুতলার ৫০ শতাংশের হাতে রয়েছে মাত্র ৬ শতাংশ।

কেন এই ব্যবধান আরও বাড়ল? সারা বিশ্বের সাথে ভারতবর্ষেও ধনী গরিবের ব্যবধান ক্রমশ বাড়ছিল। কোটি কোটি মানুষ কাজ হারাচ্ছিল। কাজ থাকলেও তাদের রোজগার ক্রমশ কমছিল। ফলে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা কমছিল। ছোট বড় ব্যবসা-কলকারখানায় একের পর এক লালবাতি জ্বলছিল। করোনাকালে লকডাউন আধা লকডাউনে মানুষের অসহায়তার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে এক ধরনের অসাধু ব্যবসায়ী তাদের মুনাফা বহুগুণে বাড়িয়েছে। একধরনের ওষুধ কোম্পানি, ভ্যাক্সিন কোম্পানি, নেট দুনিয়া, মিডিয়া ব্যবসায়ীরা সরকারি সহযোগিতায় কার্যত অবাধ লুণ্ঠন চালিয়েছে। ওষুধ বাজারের উপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ একেবারেই নেই।

সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ করে রেখে সকলকে অনলাইন পড়াশুনায় বাধ্য করা হয়েছে। করোনার সুযোগ নিয়ে নানা জনবিরোধী আইন পাশ করে যথেচ্ছভাবে শ্রমিক ছাঁটাইয়ের অধিকার মালিকদের হাতে তুলে দিয়ে কার্যত এক শ্রেণির ব্যবসায়ীদের মুনাফার পাহাড় গড়তে সাহায্য করেছে। তাই দেশের ৯৯ শতাংশ মানুষের রোজগার কমলেও ১ শতাংশ মানুষের রোজগার বেড়েছে বহুগুণে। আগে মানুষের যতটুকু বেঁচে থাকার সুযোগ ছিল, করোনাকালে মানুষের অসহায়তার সুযোগ নিয়ে এক শ্রেণির নরখাদক কর্পোরেট ব্যবসায়ী সে সুযোগটুকুও মানুষের কাছ থেকে কেড়ে নিল নরখাদকরা, যাতে ডুবন্ত মানুষগুলির মৃত্যু সুনিশ্চিত করতে পারে। আমাদের দেশের কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার সেই ব্যবস্থাকেই পাকাপোক্ত করল।

ডাঃ সজল বিশ্বাস
আগরপাড়া, উত্তর ২৪ পরগণা

পুরুষতন্ত্র ও পুঁজিবাদ

'সৌন্দর্যের প্রতিযোগিতা' (মন্তব্য, ২ জানুয়ারি ২০২২) নিবন্ধে পায়েল সেনগুপ্ত প্রতিযোগিতার যৌক্তিকতা নিয়ে যে-ভাবনার কথা তুলেছেন তা খুবই প্রাসঙ্গিক। বিষয়টিকে তাঁর 'পিছনের দিকে হাঁটা' মনে হয়েছে। এই মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক। সমাজজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আজ মেয়েরা কঠোর পরিশ্রম এবং দৃঢ় মনোবল নিয়ে এগিয়ে চলেছে। নিছক শরীরী সৌন্দর্যের এমন প্রতিযোগিতা সামগ্রিকভাবে মেয়েদের সংগ্রামের প্রতি অমর্যাদা প্রকাশ করে। দারিদ্র ও অপুষ্টির কারণে সমাজের এক বিরাট অংশের মেয়েদের বেড়ে ওঠাই পূর্ণাঙ্গ হয় না, সাধারণ সৌন্দর্যেরও অভাব ঘটে। যাদের সে অবস্থা নয়, তাদেরও সুন্দর হওয়ার পিছনে ব্যক্তিগত ভাবে কোনও ভূমিকা থাকে না। এক অংশের পুরুষের চোখ ধাঁধিয়ে দেওয়া ছাড়া এই সৌন্দর্যের কী ভূমিকা আছে! এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করে পুরুষেরাই, সৌন্দর্যকে বাজারের পণ্য হিসেবে উপস্থিত করার জন্য। তাই এই আয়োজনের পিছনে ঢালা হয় বিপুল পরিমাণ অর্থ। 'রূপ' নামক এই পণ্যের বিপণনে যা বহুগুণ হয়ে ফিরে আসে। এই পুরুষেরা নারীকে পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে দেখে না। সহকর্মী, সহযোদ্ধা হিসেবে দেখে না। দেখে ভোগ্যপণ্য হিসেবে। এর পিছনে কাজ করে আসলে পুরুষতন্ত্র ও পুঁজির মুনাফার লালসা।

পুরুষের মতোই নারীর মধ্যে ব্যক্তিত্বের যে-প্রকাশ, সেটাই তো তার সৌন্দর্য। সেই ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পায় তার কর্মদক্ষতায়, সাফল্যে। সেই সৌন্দর্য প্রকাশ পায় তার দায়িত্বশীলতায়, কর্তব্যপরায়ণতায়। নিছক শরীরী সৌন্দর্যের প্রদর্শনে কারওই কোনও মর্যাদা নেই— না নারীর, না পুরুষের। জীবনের কোনও সার্থকতাও তাতে নেই। বিজ্ঞান, সাহিত্য-সংস্কৃতি, অর্থনীতি-রাজনীতি— যে-সব ক্ষেত্রে পুরুষের সার্থকতা, নারীরও তাই। সেই সার্থকতা পুরুষের মতো মেয়েদেরও অর্জন করে নিতে হয়, কোনও পুরুষের কিংবা পুরুষ সমাজের দয়ার দান তা নয়। আপন ভাগ্য জয় করে নেওয়ার অধিকার থেকে মেয়েদের কেউ বঞ্চিত করতে পারে না। 'দুর্গমের দুর্গ হতে সাধনার ধন' সে সংগ্রাম করেই আহরণ করে নেবে।

নিবন্ধকার সঠিকভাবেই নিজেকে সুন্দর দেখানো এবং বহু জনের কাছ থেকে তার স্বীকৃতি পাওয়ার ইচ্ছাকে আদিম আকর্ষণ বলেছেন। মানুষ যত সভ্য হয়েছে তত তো সে এই আদিমতাকেই অতিক্রম করেছে। তার রুচি উন্নত হয়েছে, সংস্কৃতি উন্নত হয়েছে। একজন উন্নত জীবনবোধ সম্পন্ন মেয়ের কাছে শারীরিক সৌন্দর্যের স্বীকৃতি আসলে এক ধরনের অসম্মানও বটে। কোনও আত্মমর্যাদাসম্পন্ন মেয়ে শুধুমাত্র এমন স্বীকৃতি চাইতে পারে না। আমরা আমাদের চারপাশে প্রতিনিয়ত অজস্র 'সুন্দর' মানুষের অসুন্দর আচরণ দেখি যা আমাদের অবাক করে, পীড়িত করে। আবার তথাকথিত অসুন্দর মানুষদের সুন্দর আচরণে মুগ্ধ হই, শ্রদ্ধায় মাথা নত করি।

সৌন্দর্যের এই প্রদর্শনী ভিতরে কোথাও যদি আমাদের আনন্দ দিয়ে থাকে, তবে তার পিছনে কাজ করছে পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা। এই পুরুষতন্ত্রই মেয়েদের যুগ যুগ ধরে শুধুই 'মেয়ে' করে রেখেছে, রাখতে চেয়েছে, মানুষ হওয়ার সুযোগ দেয়নি। একদিন এই পুরুষতন্ত্রকে সব দিক থেকে রক্ষা করেছে, মদত দিয়েছে সামন্ততন্ত্র। আজ তার জায়গা নিয়েছে পুঁজিতন্ত্র। সৌন্দর্যের এই প্রদর্শনীও পুরুষতন্ত্রেরই এক বেড়াজাল। এই জালকে ছিন্নভিন্ন করার সংগ্রামটাই তো মানুষ হওয়ার সংগ্রাম। অথচ এক অংশের মেয়েরাও এই পুরুষতন্ত্রেরই শিকার হয়ে নিজেদের সুন্দরী হিসাবে তুলে ধরার প্রতিযোগিতায় ঝাঁপিয়ে পড়ে।

মেয়েদের জন্য শিক্ষার কথা ভেবেছিলেন নবজাগরণের যে মনীষীরা, তাঁরা তো এই স্বপ্নই দেখেছিলেন যে, মেয়েরা শিক্ষার আলোয় অজ্ঞতা ও কুসংস্কার থেকে মুক্ত হবে, আত্মসম্ভ্রমের অধিকারী হবে, সমগ্র নারী সমাজের বুকের ব্যথা নিয়ে মাথা তুলে দাঁড়াবে। তারা তো এটাই চেয়েছিলেন যে, শিক্ষায় এমন মেয়ে তৈরি হবে যাদের মধ্যে আত্মসম্মানবোধ আসবে, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ আসবে। তার পর বৃহত্তর নারীসমাজ, যারা অত্যাচারিত, বঞ্চিত অবস্থায় পড়ে রয়েছে, তাদের জাগাবে। মেয়েরা শুধুমাত্র পাশ করবে, রুজি রোজগার করবে, আরাম-আয়েশে জীবন কাটাবে আর নিজেদের 'সুন্দরী' করে তুলবে, স্ত্রী-শিক্ষা প্রবর্তনের এ উদ্দেশ্য তাঁদের ছিল না। তাঁদের নিরলস সংগ্রামের ফল ভোগ করেও যদি তাঁদের বুকের ব্যথাকে আমরা মনের মধ্যে বহন না-করি তবে তা হবে তাঁদের মহৎ সংগ্রামের অপমান, যা আসলে নিজেদেরও অপমান।

সমর মিত্র
কলকাতা-১৩

দেশ পত্রিকার একটি নিবন্ধকে ভিত্তি করে লেখা এই চিঠিটি দেশ পত্রিকাতেও প্রকাশিত হয়েছে। (১৭ জানুয়ারি, ২০২২)

বন্ধ জুটমিল খোলার দাবিতে শ্রীরামপুরে বিক্ষোভ

হুগলি জেলায় সাসপেনশন অফ ওয়ার্ক নোটিশের মাধ্যমে মালিকরা ইন্ডিয়া জুট মিল, ওয়েলিংটন জুট মিল, ভদ্রেশ্বর শ্যামনগর নর্থ জুট মিল, গোন্দলপাড়া জুট মিল, নর্থব্রুক জুট মিল, সোনা বিস্কুট সহ আরও কিছু কারখানা বন্ধ করে দিয়েছে। জেলায় কুড়ি হাজারের বেশি শ্রমিক কর্মচ্যুত। এদের উপর নির্ভরশীল লক্ষাধিক মানুষের জীবিকা বিপন্ন। এছাড়া অবাধে চলছে কাঁচা পাটের বেআইনি ফাটকাবাজি ও মজুতদারি।

অবিলম্বে নিঃশর্তে সমস্ত বন্ধ জুট মিল সহ সমস্ত বন্ধকারখানা খোলা, ছাঁটাই শ্রমিকদের পূর্ণ মজুরি এবং শ্রমিক পরিবারগুলির পূর্ণ চিকিৎসা ও রেশনের দাবিতে এ আই ইউ টি ইউ সি হুগলি জেলা কমিটির পক্ষে ২১ জানুয়ারি শ্রীরামপুরের মহকুমা শাসক ও জয়েন্ট লেবার কমিশনারের মাধ্যমে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। ওই দিন শ্রীরামপুর স্টেশনে অবস্থান বিক্ষোভে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট শ্রমিক নেতা এ আই ইউ টি ইউ সি-র সর্বভারতীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য দিলীপ ভট্টাচার্য।

বাঁধ মেরামতের দাবি

ময়নার দোবাদী এলাকায় কংসাবতী নদীবাঁধে ১৭ জানুয়ারি প্রায় ৬০ থেকে ৭০ মিটার অংশ ধস নামে। বর্ষার আগে কংসাবতী নদী সংস্কার হয়েছে। ধসে যাওয়া অংশের গভীরতা প্রায় সাড়ে ৩ মিটার। পূর্ব মেদিনীপুর জেলা বন্যা-ভাঙ্গন প্রতিরোধ কমিটি জরুরি ভিত্তিতে ওই ধসে যাওয়া অংশ মেরামতের দাবি জানিয়ে সেচ দপ্তরে স্মারকলিপি দিয়েছে। সংগঠনের সম্পাদক নারায়ণ চন্দ্র নায়ক বলেন, নদী খননের পর আরও কতগুলি জায়গায় ধসে যাওয়া নদীবাঁধ মেরামতের কাজ সেচ দপ্তর এখনও শেষ করেনি। ক্ষতিগ্রস্ত অংশ দ্রুত মেরামতের দাবি জানানো হয়।

মহান দার্শনিক কার্ল মার্কস ও তাঁর মতবাদ

তিনের পাতার পর

দ্বান্দ্বিকভাবে, যাঁরা শুধু ধীর পরিবর্তনটুকুই দেখেন সেই 'বিবর্তনবাদীদের' স্থূল ধারণা অনুসারে নয়। এঙ্গেলসকে এক চিঠিতে মার্কস লিখেছিলেন, 'বৃহৎ ঐতিহাসিক বিকাশের ক্ষেত্রে বিশ বছর হয়ে দাঁড়ায় এক একটি দিনের সমান, যদিও পরে এমন দিনও আসতে পারে যখন তার এক-একটি দিনেই এঁটে যায় বিশ বছর' ('পত্রাবলি', খণ্ড ৩, ১৮৬৩ সালে ৯ এপ্রিল এঙ্গেলসকে লেখা মার্কসের চিঠি)। বিকাশের প্রত্যেকটি পর্যায়ে, প্রত্যেকটি মুহূর্তে সর্বহারার রণকৌশলের উচিত মানবেতিহাসের এই অবশ্যম্ভাবী এবং বাস্তব দ্বান্দ্বিকতাকে বিবেচনায় রাখা। এই রণকৌশলকে এগিয়ে যেতে হবে একদিকে, রাজনৈতিক স্থিতাবস্থা বা শম্বুকগতিতে চলা তথাকথিত 'শান্তিপূর্ণ' বিকাশের যুগকে ব্যবহার করে অগ্রসর শ্রেণির চেতনা, শক্তি ও সংগ্রামী ক্ষমতাকে বাড়িয়ে তোলার কাজে। অন্যদিকে, এই ব্যবহারের ফলকে পুরোপুরি পরিচালিত করতে হবে এই শ্রেণির আন্দোলনের 'চূড়ান্ত লক্ষ্যের' দিকে। সেই মহান দিন— যখন এক একটি দিনেই সাধিত হয় বিশ বছরের লক্ষ্য, তা সাধনের কার্যকরী দক্ষতা অর্জনের জন্য এগিয়ে যেতে হবে অগ্রগামী শ্রেণিকে। এই প্রসঙ্গে মার্কসের দুটি যুক্তি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঃ এর একটি আছে 'দর্শনের দারিদ্র্য' গ্রন্থে, সর্বহারার অর্থনৈতিক সংগ্রাম ও অর্থনৈতিক সংগঠন প্রসঙ্গে, অন্যটি আছে 'কমিউনিস্ট ইশতেহার'-এ, সর্বহারার রাজনৈতিক কর্তব্য প্রসঙ্গে। প্রথমটিতে বলা হয়েছে ঃ 'বৃহদাকার শিল্পের ফলে একজায়গায় পরস্পর অপরিচিত বহু লোক জড়ো হয়। প্রতিযোগিতার ফলে তাদের পরস্পরের স্বার্থ আলাদা হয়ে যায়। কিন্তু মজুরির হার রক্ষা করা— মালিকের বিরুদ্ধে এই সাধারণ স্বার্থ তাদের ঐক্যবদ্ধ করে তোলে প্রতিরোধ ও সম্মিলনের একই সাধারণ চিন্তায় ... প্রথম দিকে বিচ্ছিন্ন ধরনের এই জোট রূপ নেয় গোষ্ঠীতে এবং পুঁজির নিরবচ্ছিন্ন ঐক্যের বিরুদ্ধে তাদের এই সংঘবদ্ধতাকে বাঁচিয়ে রাখা মজুরদের পক্ষে এমনকি তাদের মজুরি রক্ষার চেয়েও বেশি জরুরি হয়ে দাঁড়ায় ... এই সংগ্রামের মধ্যে— সত্যপ্রতিষ্ঠার এই গৃহযুদ্ধে— আসন্ন লড়াইয়ের প্রয়োজনীয় উপাদান হল ঐক্যবদ্ধ ও বিকশিত হওয়া। আর এই পর্যায়ে এসে সংঘবদ্ধতা গ্রহণ করে রাজনৈতিক চরিত্র' (কার্ল মার্কস, 'দর্শনের দারিদ্র')। এর মধ্য দিয়ে আমরা পাই আগামী কয়েক দশকের অর্থনৈতিক সংগ্রাম ও ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের কর্মসূচি ও রণকৌশল। 'আসন্ন লড়াইয়ের উদ্দেশ্যে' সর্বহারার শক্তিপ্রস্তুতির যে সুদীর্ঘ পর্যায় চলে, তার রণকৌশল ও কর্মসূচিও এখানে পাওয়া যায়। ব্রিটিশ শ্রমিক আন্দোলনের যে অসংখ্য দৃষ্টান্ত মার্কস ও এঙ্গেলস দিয়েছেন সেগুলিকে এর সঙ্গে মিলিয়ে পড়তে হবে ঃ কেমন করে শিল্পজনিত 'সমৃদ্ধি'র ফলে চেষ্টা হয় 'শ্রমিককে কিনে নেবার' (এঙ্গেলসের সঙ্গে পত্রাবলি', খণ্ড ১, ১৮৫১-র ৫ ফেব্রুয়ারি এঙ্গেলসকে লেখা মার্কসের চিঠি), সংগ্রাম থেকে তাদের বিচ্যুত করার, কেমন করে এই সমৃদ্ধির ফলে সাধারণভাবে 'মজুরেরা মনোবল হারায়' (খণ্ড ২, ১৮৫৭-র ১৭ ডিসেম্বর মার্কসকে লেখা এঙ্গেলসের চিঠি)। ব্রিটিশ সর্বহারা কেমন করে 'বুর্জোয়া বনে যায়'— 'সবার চেয়ে বুর্জোয়া এই জাতিটার' (ইংরেজদের) 'ইচ্ছা যেন বুর্জোয়া ব্যবস্থার সাথে একটি বুর্জোয়া অভিজাত শ্রেণি এবং বুর্জোয়া প্রলেতারিয়েতও গড়ে তোলা' (খণ্ড ২, ১৮৫৮-র ৭ অক্টোবর মার্কসকে লেখা এঙ্গেলসের চিঠি)। কেমন করে ব্রিটিশ সর্বহারার 'বিপ্লবী উদ্দীপনা' লোপ পায় (খণ্ড ৩, ১৮৬৩-র ৮ এপ্রিল মার্কসকে লেখা এঙ্গেলসের চিঠি)। ব্রিটিশ শ্রমিকরা 'এই আপাতদৃষ্ট বুর্জোয়া সংক্রমণ থেকে কী ভাবে নিজেদের মুক্ত করতে পারে' তার জন্যে কেন অপেক্ষা করতে হবে দীর্ঘ দিন। (খণ্ড ৩, ১৮৬৩-র ৯ এপ্রিল এঙ্গেলসকে লেখা মার্কসের চিঠি)। ব্রিটিশ শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যে কেমন করে 'চার্টিস্টসুলভ তেজের' অভাব ঘটছে (১৮৬৬; খণ্ড ৩, ১৮৬৬-র ২ এপ্রিল এঙ্গেলসকে মার্কসের চিঠি) *(চার্টিজম ঃ উনিশ শতকের চতুর্থ ও পঞ্চম দশকে ব্রিটিশ শ্রমিকদের প্রথম বৈপ্লবিক গণআন্দোলন। চার্টিস্টরা পার্লামেন্টের কাছে তাদের আবেদনপত্র 'জনগণের চার্টার' পেশ করেছিল এবং লড়েছিল সর্বজনীন ভোটাধিকার, পার্লামেন্টের প্রার্থীদের ভূ-সম্পত্তিগত যোগ্যতার নিয়ম লোপ করা ইত্যাদি দাবিদাওয়া নিয়ে। বহু বছর ধরে চলা এই আন্দোলনে সামিল হয়েছিল লক্ষ লক্ষ শ্রমিক ও কারিগর। সরকার চার্টিস্টদের উপর নিষ্ঠুর প্রতিশোধ নিয়েছিল। আন্দোলন দমন করেছিল। কিন্তু আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের পরবর্তী বিকাশে এর বিরাট প্রভাব পড়েছিল)*। কী ভাবে ব্রিটিশ শ্রমিক-নেতৃবৃন্দ গড়ে উঠছে 'র‍্যাডিকাল বুর্জোয়া ও শ্রমিকের' মাঝামাঝি একটা ধরন হিসেবে (হোলিওক প্রসঙ্গে, খণ্ড ৪, পৃঃ ২০৯)। কীভাবে সর্বহারার উপর ইংল্যান্ডের একচেটিয়া অধিকারের প্রভাব পড়ছে এবং যতদিন পর্যন্ত এই অধিকার না ভাঙছে, ততদিন পর্যন্ত আর 'ব্রিটিশ শ্রমিকদের নড়াচড়া করানো যাবে না' (খণ্ড ৪, ১৮৬৯-এর ১৯ নভেম্বর এবং ১৮৮১-র ১১ আগস্ট মার্কসকে লেখা এঙ্গেলসের চিঠি)। শ্রমিক আন্দোলনের সাধারণ ধারা (ও পরিণতি) প্রসঙ্গে অর্থনৈতিক সংগ্রামের রণকৌশলকে এখানে দেখা হয়েছে একটি চমৎকার বিস্তৃত, সর্বাঙ্গীণ, দ্বান্দ্বিক এবং যথার্থ বিপ্লবী দৃষ্টিকোণ থেকে।

রাজনৈতিক সংগ্রামের রণকৌশল প্রসঙ্গে 'কমিউনিস্ট ইশতেহার' হাজির করেছে মার্কসবাদের মূল নীতি ঃ 'শ্রমিক শ্রেণির আশু লক্ষ্য ও স্বার্থসাধনের জন্যে কমিউনিস্টরা লড়াই করে, কিন্তু বর্তমানের এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তারা ভবিষ্যৎ আন্দোলনকে তুলে ধরে ও তাকে রক্ষা করে।' সে জন্যই ১৮৪৮ সালে মার্কস সমর্থন জানিয়েছিলেন পোল্যান্ডের 'কৃষি বিপ্লবের' পার্টিকে, 'সেই পার্টি, যা ১৮৪৬ সালে ক্রাকোভে অভ্যুত্থান ঘটায়' *(ক্রাকোভ প্রজাতন্ত্রে জাতীয় মুক্তির জন্য গণতান্ত্রিক অভ্যুত্থান হয়। ১৮১৫ থেকে এই প্রজাতন্ত্র অস্ট্রিয়া, প্রুশিয়া ও রাশিয়ার যুক্ত নিয়ন্ত্রণে ছিল। বিদ্রোহীরা একটি জাতীয় সরকার স্থাপন করেছিল। সেই সরকার সমস্ত সামন্ততান্ত্রিক সেবাকর্মের বিলুপ্তি এবং খালাসিপণ ছাড়াই কৃষকদের জমি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। ঘোষণা করেছিল বিভিন্ন জাতীয় কর্মশালা স্থাপিত হবে যেখানে মজুরির হার হবে উঁচু, চালু করা হবে সমস্ত নাগরিকের সমান অধিকার। এই অভ্যুত্থানটিও দমন করা হয়েছিল)*। জার্মানিতে ১৮৪৮-১৮৪৯ সালে মার্কস চরমপন্থী বিপ্লবী গণতন্ত্রীদের সমর্থন করেছিলেন এবং রণকৌশল সম্পর্কে তখন যা বলেছিলেন তা পরে কখনও প্রত্যাহার করেননি। তাঁর দৃষ্টিতে জার্মান বুর্জোয়ারা হল এমন লোক, যারা 'জনগণের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা এবং পুরনো সমাজের রাজমুকুটধারী প্রতিনিধিদের সঙ্গে আপস করার জন্যে একেবারে প্রথম থেকেই ঝুঁকেছে' (কৃষকসম্প্রদায়ের সঙ্গে মৈত্রীতেই কেবল বুর্জোয়াদের কর্তব্যের সামগ্রিক সাধন সম্ভব হতে পারত)। বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের যুগে জার্মান বুর্জোয়াদের শ্রেণিগত অবস্থান সম্পর্কে মার্কস প্রদত্ত সামগ্রিক বিশ্লেষণের সারটুকু এখানে তুলে দেওয়া গেল, প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, এই বিশ্লেষণ সেই বস্তুবাদের একটি নিদর্শন, যাতে সমাজকে গতির মধ্যে দেখা হয় এবং তা শুধু পশ্চাদমুখী অভিমুখে নয়। বিশ্লেষণগুলি হল— '...না আছে নিজের ওপর আস্থা, না আছে জনগণের ওপর বিশ্বাস, ওপরে যারা রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে অসন্তোষ, নিচের তলার সামনে কাঁপুনি, ... বিশ্বঝটিকায় ভীত, কোনও দিকেই উদ্যম নেই, আর সব দিকেই অন্যের কৃতিত্ব চুরি... উদ্যোগহীন।... অভিশপ্ত এক বৃদ্ধ যে বইছে একটা নবীন ও বলিষ্ঠ জাতির প্রথম যৌবনোদ্দীপনাকে নিজের জরাগ্রস্ত স্বার্থে চালিত করার শাস্তি...' (নিউ রাইনসে জাইতুং ১৮৪৮; 'সাহিত্যিক উত্তরাধিকার', খণ্ড ৩, কার্ল মার্কস ঃ 'বুর্জোয়া শ্রেণি এবং প্রতিবিপ্লব', দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ)। কুড়ি বছর পরে এঙ্গেলসকে লেখা চিঠিতে (খণ্ড ৩, পৃঃ ২২৪) মার্কস ঘোষণা করেন, ১৮৪৮ সালের বিপ্লব ব্যর্থ হয়েছিল। কারণ, মুক্তির আশায় সংগ্রামের বদলে বুর্জোয়ারা দাসত্ব সহ শান্তিই বাঞ্ছনীয় মনে করেছিল। ১৮৪৮-১৮৪৯ সালের বিপ্লবী যুগ শেষ হলে মার্কস বিপ্লব নিয়ে খেলা করার যে কোনও প্রচেষ্টার বিরোধিতা করেছিলেন (শাপার ও ভিলিখ এবং তাদের সঙ্গে সংগ্রাম) এবং নতুন যুগে কাজ করতে পারার দক্ষতার উপর জোর দিয়েছিলেন, যা ছিল আপাত 'শান্তিপূর্ণভাবে' নতুন বিপ্লবের প্রস্তুতি। যে শক্তিতে সে কাজ চালানোর কথা মার্কস ভেবেছিলেন তা দেখা যাবে ঘোরতর প্রতিক্রিয়ার কালে, ১৮৫৬ সালে জার্মানির অবস্থা সম্পর্কে তাঁর এই মূল্যায়নে— 'জার্মানিতে কৃষক সমরের দ্বিতীয় সংস্করণের মতো কোনও কিছু দিয়ে সর্বহারা বিপ্লবকে সাহায্য করতে পারার সম্ভাবনার ওপরেই সব কিছু নির্ভর করবে' ('এঙ্গেলসের সঙ্গে পত্রাবলি', খণ্ড ২, ১৮৫৬-র ১৬ এপ্রিল এঙ্গেলসকে লেখা মার্কসের চিঠি)। জার্মানিতে গণতান্ত্রিক (বুর্জোয়া) বিপ্লব সমাধা না হওয়া পর্যন্ত মার্কস সমাজতান্ত্রিক সর্বহারার রণকৌশলের প্রতি তাঁর সমস্ত মনোযোগ নিবিষ্ট করেছিলেন কৃষক-সম্প্রদায়ের গণতান্ত্রিক উদ্যম বিকাশের জন্য। তাঁর মতে লাসাল 'প্রুশীয়ার স্বার্থে শ্রমিক আন্দোলনের প্রতি কার্যক্ষেত্রে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন (খণ্ড ৩, ১৮৬৫-র ২৭ জানুয়ারি মার্কসকে লেখা এঙ্গেলসের চিঠি), জমিদার ও প্রুশীয় জাতীয়তাবাদের প্রতি লাসালের প্রশ্রয়ই এর কারণ। সংবাদপত্রে একটি যুক্ত বিবৃতি দেওয়া প্রসঙ্গে এঙ্গেলস মার্কসের সঙ্গে মতবিনিময় করতে গিয়ে ১৮৬৫ সালে লিখেছিলেন ঃ 'কৃষিনির্ভর দেশে, সামন্ত অভিজাতদের 'চাবুকের তলায়' গ্রাম্য মজুরদের পিতৃতান্ত্রিক 'শোষণের' কথা ভুলে গিয়ে শিল্প শ্রমিকদের নামে শুধু, বুর্জোয়াদেরই আক্রমণ করাটা অতি নীচ কাজ' (খণ্ড ৩, ১৮৬৫-র ৫ ফেব্রুয়ারি মার্কসকে এঙ্গেলসের চিঠি)। ১৮৬৪-১৮৭০ সালে যখন জার্মানিতে শেষ হয়ে আসছিল বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব সমাধার যুগ, ওপর থেকে যে-কোনও পন্থায় বিপ্লবটা সম্পূর্ণ করার জন্যে প্রুশীয়ার ও অস্ট্রিয়ার শোষক শ্রেণিগুলির সংগ্রামের যুগ, তখন মার্কস শুধু যে বিসর্মাকের সঙ্গে দহরম-মহরমকারী লাসালেরই নিন্দা করেন তা নয়, লিবনেখটের ত্রুটিও সংশোধন করে দেন—যিনি 'অস্ট্রীয় গৌরববাদ' (অস্ট্রিয়ফিলিসিজম) ও গোষ্ঠীগত বিশেষত্বের গৌরবের (পার্টিকুলারিজম) সমর্থনে ঝুঁকেছিলেন। মার্কস দাবি করলেন এমন বিপ্লবী রণকৌশল—যা বিসমার্ক ও অস্ট্রোফিল উভয়ের সঙ্গে সংগ্রামে হবে সমান নির্মম, যা 'বিজয়ীদের'—প্রুশীয় জমিদারদের তোয়াজ করবে না। বরং প্রুশীয় সামরিক জয়লাভের ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতি সত্ত্বেও তাদের বিরুদ্ধেই অবিলম্বে নতুন করে বিপ্লবী সংগ্রাম শুরু করবে ('এঙ্গেলসের সঙ্গে পত্রাবলি', খণ্ড ৩, ১৮৬৩-র ১১ জুন ও ২৪ নভেম্বর, ১৮৬৪-র ৪ সেপ্টেম্বর, ১৮৬৫-র ২৭ জানুয়ারি, ১৮৬৭-র ২২ অক্টোবর ও ৬ ডিসেম্বর মার্কসকে লেখা এঙ্গেলসের চিঠি এবং ১৮৬৩-র ১২ জুন, ১৮৬৪-র ১০ ডিসেম্বর, ১৮৬৫-র ৩ ফেব্রুয়ারি ও ১৮৬৭-র ১৭ ডিসেম্বর এঙ্গেলসকে লেখা মার্কসের চিঠি)। আন্তর্জাতিকের ১৮৭০ সালের ৯ সেপ্টেম্বরের বিখ্যাত অভিভাষণে অকাল অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে মার্কস ফ্রান্সের সর্বহারাদের হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও যখন অভ্যুত্থান ঘটে গেল (১৮৭১) তখন মার্কস

পেট্রোগ্রাডে ফিনল্যান্ড স্টেশন চত্বরে ভাষণরত লেনিন

আটের পাতায় দেখুন

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2022-24

আবেগ ও শ্রদ্ধায় নেতাজি-স্মরণ

২৩ জানুয়ারি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের আপসহীন বিপ্লবী ধারার মূর্ত প্রতীক নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ১২৬তম জন্মদিনে 'সারা বাংলা নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু ১২৫তম জন্মবার্ষ উদযাপন কমিটি'-র উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত জেলায় অসংখ্য অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। এআইডিএসও, এআইডিওয়াইও, এআইএমএসএস সহ নানা গণসংগঠনও বহু কর্মসূচি নেয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যেও সাধারণ মানুষ ও ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। কমিটির উদ্যোগে মূল অনুষ্ঠানটি হয় স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম পীঠস্থান তমলুক শহরে। সেখানে বৈকুণ্ঠ সরোবরের উত্তর দিকে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর পূর্ণাবয়ব মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হয় (ছবি)। কমিটির 'তাম্রলিপ্ত শাখা'-র উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে মূর্তির আবরণ উন্মোচন করেন পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন অ্যাডভোকেট জেনারেল বিমল চ্যাটার্জী। এই উপলক্ষে বিকালে তমলুক সুইমিং ক্লাব প্রাঙ্গণে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে এই মহান বিপ্লবীর জীবন নিয়ে আলোচনা করেন 'তমলুক বিদ্যাসাগর কৃষ্টি সম্মিলনী'র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা মানব বেরা। বক্তব্য রাখেন, 'নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন কমিটি'র রাজ্য সম্পাদক ডাক্তার অশোক সামন্ত প্রমুখ। উপস্থিত ছিলেন তমলুক পৌরসভার চেয়ারপার্সন দীপেন্দ্র নারায়ণ রায়, কো-অর্ডিনেটর সুব্রত রায় সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি। সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক মদনমোহন মাইতি। উদযাপন কমিটির সভাপতি অধ্যাপক ডঃ মধুসূদন জানা এবং সম্পাদক শিক্ষক সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় স্বাধীনতা আন্দোলনে তমলুকের ঐতিহাসিক ভূমিকা তুলে ধরেন।

দক্ষিণ ২৪ পরগনার লক্ষীকান্তপুরেও এইদিন কমিটির লক্ষীকান্তপুর শাখার পক্ষ থেকে নেতাজির পূর্ণাবয়ব মূর্তি প্রতিষ্ঠা করার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও আলোচনা সভা হয়। উপস্থিত ছিলেন কমিটির সহ সভাপতি অধ্যাপক মহীদাস ভট্টাচার্য।

'নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন সর্বভারতীয় কমিটি' এ দিন একটি সর্বভারতীয় অনলাইন আলোচনা সভার আয়োজন করে। সভাপতিত্ব করেন অমৃতসর সরকারি মেডিকেল কলেজের এমিরেটাস অধ্যাপক ডাঃ শ্যামসুন্দর দীপ্তি। নেতাজির জীবনসংগ্রাম ও কর্মকাণ্ড নিয়ে বক্তব্য রাখেন কর্ণাটক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক জওহর নেসান, দিল্লির জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সচ্চিদানন্দ সিনহা। সর্বশেষে আলোচনা করেন আইআইএসইআর কলকাতার অধ্যাপক প্রখ্যাত বিজ্ঞানী এবং সর্বভারতীয় কমিটির কার্যকরী সভাপতি ডঃ সৌমিত্র ব্যানার্জী। স্বাগত বক্তব্য রাখেন কমিটির সদস্য ডাঃ অংশুমান মিত্র। কমিটির সর্বভারতীয় সম্পাদিকা ভারতী মুখার্জী আগামী এক বছর ধরে নেতাজি বিষয়ক নানা কাজকর্ম চালিয়ে যাওয়ার কথা ঘোষণা করেন।

উত্তরপ্রদেশ বিধানসভায় এস ইউ সি আই (সি) লড়ছে ১০টি আসনে

সংগ্রামী বামপন্থার ঝান্ডা ঊর্ধ্বে তুলে ধরে শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলন তীব্রতর করতে এসইউসিআই(সি) উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনে এককভাবে ১০টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। পুঁজিপতি শ্রেণির বিশ্বস্ত দল রাজ্যের ও কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধেই শুধু নয়, অন্যান্য জাতিবাদী দলগুলির ভ্রান্ত রাজনীতির এবং মেকি কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে সংগ্রামী বামপন্থার ভিত্তিতে প্রচারে নেমেছে দলের প্রার্থীরা।

প্রার্থী তালিকা ঃ

১। মোরাদাবাদ শহর - **কমরেড অবিনাশ চন্দ্র সাক্সেনা,** ২। মোরাদাবাদ গ্রামীণ - **কমরেড শিশুপাল সিংহ রাজপুত,** ৩। সিকান্দারা কানপুর গ্রামীণ - **কমরেড রামগোবিন্দ যাদব,** ৪। কল্যাণপুর কানপুর - **কমরেড অনুপ কাটিয়ার,** ৫। লম্ভুয়া-সুলতানপুর - **কমরেড রাজেন্দ্র প্রসাদ মৌর্য,** ৬। পাট্টি, প্রতাপগড়- **কমরেড রাজমণি বিশ্বকর্মা,** ৭। বদলাপুর- **কমরেড রামগোবিন্দ সিংহ,** ৮। জৌনপুর শহর - **কমরেড প্রবীণ কুমার শুক্লা,** ৯। মউ - **কমরেড শৈলেন্দ্র কুমার,** ১০। রসরা বালিয়া - **কমরেড রাম প্রবেশ।**

মহান লেনিন স্মরণে

২১ জানুয়ারি দলের সল্টলেক সেন্টারে লেনিনের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান পলিটবুরো সদস্য কমরেড অসিত ভট্টাচার্য (বামে)। কেন্দ্রীয় অফিসে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান পলিটবুরো সদস্য কমরেড সৌমেন বসু

বিদ্যুৎ বন্টন কোম্পানির ঠিকা কর্মীরা আন্দোলনে

রাজ্যের বিদ্যুৎ বন্টন কোম্পানির ঠিকাকর্মীরা দীর্ঘদিন ধরে সীমাহীন বঞ্চনার শিকার। সম ও সমজাতীয় কাজে সম মজুরি, চাকরির নিশ্চয়তা, নির্দিষ্ট দিনে বেতন ও বাড়তি কাজের জন্য প্রাপ্য মজুরি থেকে এই সমস্ত কর্মীরা বঞ্চিত। বিদ্যুৎ বন্টন কোম্পানি রাজ্য সরকার ঘোষিত ন্যূনতম মজুরিভুক্ত শিল্পগুলির মধ্যে পড়ে না। এতদসত্ত্বেও পূর্বতন সিপিএম সরকারের জমানা থেকে এই সমস্ত কর্মীদের ন্যূনতম মজুরিভুক্ত নির্মাণকর্মীর মজুরি দেওয়া হচ্ছে। রাজ্যের সরকার পরিবর্তন হলেও এই বেআইনি কাজ বন্ধ হয়নি।

এই বঞ্চনার বিরুদ্ধে ঠিকাকর্মীরা আপসকামী ও সরকার মুখাপেক্ষী সংগঠনগুলো থেকে বেরিয়ে এসেও এ আই ইউ টি ইউ সি-র নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ বন্টন কোম্পানি লিমিটেড কন্ট্রাক্টরস ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন গড়ে তোলেন। জন্মলগ্ন থেকেই ইউনিয়ন বিদ্যুৎশিল্পের ঠিকাকর্মীদের প্রতি বঞ্চনা নিরসনের দাবিতে একটার পর একটা আন্দোলন গড়ে তোলার পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট কর্মীদের কাজের মূল্যায়নের ভিত্তিতে ক্যাটাগরি নির্ধারণ করে বেতন দেওয়ার দাবিতে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করে। ২৯ জুলাই, ২০২১ কলকাতা হাইকোর্ট তিন মাসের মধ্যে এই সমস্ত কর্মীদের ক্যাটাগরি তৈরি করে বেতন নির্ধারণ করার আদেশ দিলেও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শ্রমদপ্তর নানা টালবাহানা করে এখনও পর্যন্ত তা কার্যকর করেনি। এই পরিস্থিতিতে ইউনিয়নের পক্ষ থেকে ২০ জানুয়ারি রাজ্যব্যাপী ঠিকা কর্মীদের বিক্ষোভ ও দাবি দিবস পালনের ডাক দেওয়া হয়।

এদিনের কর্মসূচিতে দার্জিলিং থেকে গোসাবা পর্যন্ত বিভিন্ন বিভাগের ঠিকা কর্মচারীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন। দার্জিলিং, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, মুর্শিদাবাদ,

বীরভূম, নদীয়া, উত্তর ২৪ পরগণা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর ও পূর্ব মেদিনীপুর জেলার প্রায় ২০০টি কাস্টমার কেয়ার সেন্টার ও ৩৩/১১ কেভি সাবস্টেশনে কর্মসূচি পালিত হয়। ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মানস কুমার সিংহ জানিয়েছেন অবিলম্বে উপরোক্ত দাবিগুলি পূরণ না হলে কর্মচারীরা কর্মবিরতির পথে যেতে বাধ্য হবেন এবং তার দায় বর্তাবে সম্পূর্ণরূপে বিদ্যুৎ বন্টন কোম্পানির কর্তৃপক্ষের উপর।

মহান দার্শনিক কার্ল মার্কস

সাতের পাতার পর

সোৎসাহে 'স্বর্গ জয়ী অভিযাত্রী' জনগণের বিপ্লবী উদ্যোগকে অভিনন্দিত করেছিলেন (কুগেলমানের কাছে মার্কসের চিঠি, ১৮৭১-এর ১২ এপ্রিল)। মার্কসের দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে, অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রের মতো এই ক্ষেত্রেও, অধিকৃত অবস্থান ছেড়ে দেওয়া কিংবা, বিনা যুদ্ধে আত্মসমর্পণের চেয়ে বরং বিপ্লবী সংগ্রামের পরাজয় সর্বহারা শ্রেণির সংগ্রামের সাধারণ গতি ও পরিণতির পক্ষে ছিল কম ক্ষতিকর। এরকম আত্মসমর্পণে সর্বহারাদের মনোবল ভেঙে যেত, সংগ্রামী শক্তি হ্রাস পেত। রাজনৈতিক স্থিতাবস্থা ও বুর্জোয়া আইনের প্রাধান্যের যুগে সংগ্রামের আইনসঙ্গত উপায়গুলি প্রয়োগের মূল্য মার্কস পুরোপুরি অনুভব করেছিলেন এবং ১৮৭৭ ও ১৮৭৮ সালে সমাজতন্ত্র-বিরোধী আইন (সমাজতন্ত্র বিরোধী জরুরি আইনে জার্মানিতে ১৮৭৮-'৯০ পর্যন্ত সোসাল ডেমোক্রেটিক পার্টির সমস্ত কিছু নিষিদ্ধ করা হয়েছিল) পাশ হয়ে যাওয়ার পর তিনি মস্ট-এর 'বিপ্লবী বুলির' তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। কিন্তু সমাজতন্ত্র-বিরোধী আইনের জবাবে যখন স্বীকৃত সোসাল ডেমোক্রেটিক পার্টির পক্ষ থেকে সঙ্গে সঙ্গে স্থির প্রতিজ্ঞায়, দৃঢ়তা ও বৈপ্লবিক মানসিকতার সাথে আইন ভঙ্গকারী সংগ্রাম গ্রহণের মতো তৎপরতা দেখা গেল না, তখন এই পার্টিতে যে সুবিধাবাদ সাময়িকভাবে মাথা তুলেছিল তাকেও মার্কস যে ভাবে আক্রমণ করেছিলেন সেটা কম তীব্র ছিল না ('এঙ্গেলসের সঙ্গে পত্রাবলি', খণ্ড৪, ১৮৭৭-এর ২৩ জুলাই, ১ আগস্ট ও ১৮৭৯-র ১০ সেপ্টেম্বর এঙ্গেলসকে মার্কসের চিঠি এবং ১৮৭৯-র ২০ আগস্ট ও ৯ সেপ্টেম্বর মার্কসকে লেখা এঙ্গেলসের চিঠি। জরগের কাছে লেখা চিঠিগুলিও দ্রষ্টব্য)।

লিখিত ঃ জুলাই - নভেম্বর, ১৯১৪ (শেষ)

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com